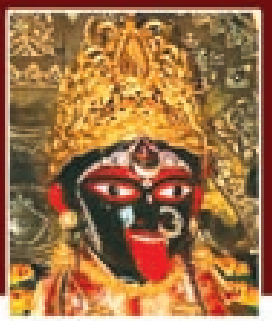

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

৬৭ বর্ষ, ৮ সংখ্যা।। ২৩ অক্টোবর - ২০১৪।। ৭ কার্তিক - ১৪২১।। দীপাবলী সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

শাসক দলের সঙ্গে জঙ্গি-যোগসাজস?

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ২ কার্তিক, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

২০ অক্টোবর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৭

খোলা চিঠি : জামাত-উল-তৃণমূল ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৮

ভারতের মাটিতে মোগলিস্তান গঠনই জেহাদিদের লক্ষ্য ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

দেশের নবনির্মাণের জন্য সারা সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে : মোহন ভাগবত ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১১

শাসকের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর ▯ বিদ্যাধর ভট্টাচার্য ▯ ১৫

পশ্চিমবাংলার আকাশে ইসলামি মৌলবাদের অশনি সঙ্কেত ▯ দেবব্রত ঘোষ ▯ ১৭

প্রেম-জিহাদের বিপদ ▯ শূলপানি বর্মন ▯ ১৯

কালীপ্রসঙ্গ ▯ স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ ▯ ২১

মহাদেবী মহাকালী অচিন্ত্যরূপ চরিত ▯ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ▯ ২৭

অনুপ্রবেশের সঙ্কট ▯ রুদ্রনীল ঘোষ ও চন্দন নন্দী ▯ ৩১

বহু প্রকল্পে যৌথ উদ্যোগের শিলমোহর, বাস্তবায়িত করতে চাই উভয় রাষ্ট্রের প্রচণ্ড রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ▯ মে: জে: কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) ▯ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ২৯ ▯ **অঙ্গনা : ৩০** ▯ **অন্যরকম : ৩৭** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৯** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৪১-৪৩** ▯ **রঙ্গম : ৪৪** ▯

শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা

শুভ বিজয়া ও দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে স্বস্তিকা-র সকল পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, লেখক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

—স্বস্তিকা পরিবার

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সন্ত্রাসের উৎস অনুপ্রবেশ

তৃণমূলের সৌজন্যে দ্বিতীয় কাশ্মীর হতে চলেছে এরাজ্য। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের হাতে রাজ্যের সীমান্ত এলাকার বেশিরভাগটাই আজ দখলীকৃত। সেই দখলীকৃত এলাকা কায়েম করার জন্য 'মোগলিস্তান', 'বৃহত্তম ইসলামিক বাংলাদেশ' গঠনের দাবিও শোনা যাচ্ছে। তৃণমূল-জামাতে ইসলামির যৌথ উদ্যোগে এবার আরম্ভ হয়েছে সন্ত্রাসের মহড়া। রাজ্যের আনাচে-কানাচে তৈরি হয়েছে অস্ত্র কারখানা। সেই অস্ত্র এপার-ওপার দু-দেশের মানুষকে করছে সন্ত্রস্ত। এই নিয়েই এবারের বিশেষ বিষয়। লিখেছেন— বিমল প্রামাণিক ও মোহিত রায়।

HB®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

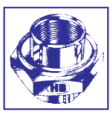

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মা-মাটি-মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিয়া আজ বাঙালির করুণা হইতেছে। এমন জানিলে বাঙালি কবেই তাঁহাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিত। বাঙালি আরও ৩৪ বছর ধরিয়া সিপিএমের অত্যাচার সহ্য করিত কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এমন দেশোদ্রোহীকে কখনই ক্ষমতায় আনিত না। ভিজে বেড়াল সাজিয়া তিনি বাঙালির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। সততার বোরখা পরিয়া দলকে সারদার টাকা লুঠ করিতে উৎসাহ দিয়াছেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জেহাদিদের হাতে দেশটাকেই উপঢৌকন দিবার মতলব করিতেছেন। এমন মানুষ ক্ষমতার শীর্ষে থাকিলে বাঙালির নিরাপত্তা বিপন্ন হইবে। মা-মাটি-মানুষের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা বাঙালি কখনই সহ্য করিবে না। মা-মাটি-মানুষের সাইনবোর্ড লাগাইয়া তিনি মা-মাটি-মানুষকেই অপমান করিতেছেন। সারদার টাকা তাঁহার দলের নেতামন্ত্রীরা লুঠ করিয়াছেন বলিয়া ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইতেছে। ভবিষ্যতে আরও অনেকে জেলে যাইবেন। এখন বোধগম্য হইতেছে কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারদাকাণ্ডে সিবিআই বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সুপ্রিম কোর্টে করদাতাদের ১১ কোটি টাকা খরচ করিয়া আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নিজেকে রক্ষা এবং দলের নেতামন্ত্রীদের রক্ষা করিতেই তাঁহার এই তৎপরতা। বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডেও তাঁহার দল ও জঙ্গিগোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগ। মা-মাটি-মানুষের দল যে আজ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান সহায়তাকারী তাহা যাহাতে প্রকাশিত না হইতে পারে সেই কারণে এন আই এ তদন্তে বিরোধিতা। রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রসচিব পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করিতে তৎপর। সংখ্যালঘু তোষণের নামে সম্পূর্ণ রাজ্যটিকেই সন্ত্রাসবাদীদের হাতে তুলিয়া দিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে তৃণমূল সরকার। অনুপ্রবেশের নামে জঙ্গি আমদানি করিয়া নিজ ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করিয়াছে তৃণমূল। এক সন্ত্রাসবাদীকে রাজ্যসভার সদস্য পর্যন্ত করিয়াছে। সেই সন্ত্রাসবাদী নলিয়াখালি ক্যানিং-এ দলবল লইয়া দাঙ্গা বাঁধাইয়া হিন্দুদের টাকা-পয়সা লুঠ করিয়াছিল। সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ত্রাস চালাইতেছে তৃণমূল জামাত যৌথবাহিনী। গ্রামে গ্রামে অস্ত্রকারখানা গড়া হইয়াছে। জামাত সিমি আই এস আই জেহাদি শিবির করিতেছে গ্রামে গ্রামে আর তৃণমূল দল তাহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে মদত করিতেছে, সহায়তা করিতেছে। বর্ধমানেও যে বাড়িতে বিস্ফোরণ হইয়াছে সেই বাড়ির অন্দরে বিস্ফোরক তৈরির কারখানা আর সামনে তৃণমূলের অফিস। তৃণমূলের কেন্দ্রীয় দপ্তরেও নিত্য জামাত-আই এস আইয়ের কর্মকর্তাদের যাতায়াত কিসের জন্য?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক স্বপ্ন দেখাইয়া বাঙালিকে ধোঁকা দিয়াছেন। বাঙালি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভাবমূর্তি নাটকীয়পনা দেখিয়া বোকা বনিয়াছে। আসলে তিনি যে একটি জালিয়াত তাহা ধীরে ধীরে প্রমাণিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাইতে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রয়োজন। কেন্দ্র এখনই সতর্ক না হইলে রাজ্যটি ধীরে ধীরে জঙ্গিদের হাতে চলিয়া যাইবে। কাশ্মীরের হইতেও ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে চলিতেছে পশ্চিমবঙ্গ। বাঙালির দুর্ভাগ্য যাঁহাকে আপন ঘরের মেয়ে ভাবিয়াছিল, সেই মেয়েটিই যে বাঙালির কবর নির্মাণ করিবার ঠেকা লইবে জঙ্গিদের সাহায্য করিবার জন্য তাহা কল্পনারও অতীত ছিল। বাঙালি মহিলা দেশরক্ষার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বলি দিয়াছেন, কিন্তু দেশের শত্রুকে কখনও সহায়তা করেন নাই। এত কিছুর পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্লজ্জের মতো যে বড় বড় কথা বলিতেছেন ইহা তাঁহার পক্ষেই শোভন। শূন্য কলসীর আওয়াজই বেশি হয় সব সময়।

সুভাষিত

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছতি নষ্টং নেচ্ছতি শোচিতুম্।

আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ।। (চাণক্যনীতি)

জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপ্রাপ্য বস্তু পেতে ইচ্ছা করেন না, নষ্ট বস্তুর জন্য অনুশোচনা করেন না ও বিপদে কখনো মুহ্যমান হয়ে পড়েন না।

মালদায় বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ

সংবাদদাতা।। বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই মালদা জেলার ইংরেজ বাজার ব্লকের যদুপুর ১নং অঞ্চলের নরেন্দ্রপুর গ্রামে বোমা বাঁধার সময় প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় এবং তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় মালদার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। এই খবরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতদেহগুলিকে রাতারাতি কবর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে শক্তিশালী এই বোমা বিস্ফোরণের শব্দে গত ৫ অক্টোবর কাঞ্চনতার, মহারাজপুর এলাকা কেঁপে ওঠে। স্থানীয় মানুষ অনেকেই ভেবেছিল ট্রাকের চাকা ফাটার শব্দ। কিন্তু পরে জানা যায় বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। যে সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে সেই সময় কাঞ্চনতার মহারাজপুর সর্বজনীন দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি চলছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১২ জনের একটি দুষ্কৃতীদল নরেন্দ্রপুর গ্রামের পাশে লিচু বাগানে বোমা বাঁধছিল। হঠাৎ সেই বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। মানুষ ছুটে গিয়ে দেখে ছিন্ন ভিন্ন দেহের অংশ পড়ে রয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, বিস্ফোরণের পর দুষ্কৃতীদের দেহাংশ ১৫ ফুট উপরে উঠে গাছে আটকে যায়। আমগাছ ও লিচুগাছ ঝলসে যায়। গুরুতর আহত তিনজনকে উজির শেখ (২৫), আবদুল্লা শেখ (২৩) ও জোশিম শেখ (১৯) মালদা শহরের পাশে অ্যাপোলো নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলেও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পুলিশকে এই বোমা বিস্ফোরণে আহতদের কথা জানায়নি। নার্সিংহোমে ভর্তি তিন আহত দুষ্কৃতীর অভিভাবক বোমা বাঁধার কথা স্বীকার না করলেও পুলিশ বিস্ফোরণের খবর মেনে নিয়েছে। উল্টে তাদের অভিভাবকরা নিজেদের বাঁচাতে মোটরবাইকে করে এসে এদের বোমা মেরে যাওয়ার গল্প শোনাচ্ছে। জানা গেছে, ঘটনাস্থলের ছবি স্থানীয় কেউ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে।

পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের কাছে বোমা বাঁধতে গিয়ে তিনজনের গুরুতর আহত হওয়ার কথা স্বীকার করলেও বিস্ফোরণে মৃত্যুর কথা অস্বীকার করেছেন। অনান্য সংবাদপত্রে একজন মৃত ব্যক্তির দেহ লোপাটের খবর দিলেও নাম জানাতে পারেনি। স্থানীয় মানুষ বিস্ফোরণ নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেও বিস্ফোরণে মৃত তিনজন দুষ্কৃতী যারা বোমা বাঁধতে গিয়ে মারা গিয়েছে তাদের নাম জানা গেছে। এরা হলো— মানিরুল আলি ওরফে মানিক শেখ (৪০) পিতা-নফর আলি, সানিউল শেখ (৩২) পিতা- সেরাজুল শেখ, মোসালাউদ্দিন শেখ (৩২) পিতা-রস্তম শেখ। সকলের বাড়ি নরেন্দ্রপুর গ্রামে, ডাকঘর— কাঞ্চনতার। এতবড় বিস্ফোরণ ঘটার পরও পুলিশ প্রশাসন তেমন ভাবে তদন্তে নামেনি। মৃতদেহগুলিকে খোঁজারও কোনো চেষ্টা করছে না। দুষ্কৃতীরা এত শক্তিশালী বোমা কেন তৈরি করছিল কিংবা এদের কারা বোমা বাঁধতে মদত জুগিয়েছে তাদের কোনো খবর প্রশাসন দিতে পারছে না। কোনো নিষিদ্ধ ইসলামী সংগঠন এদের পিছনে আছে কিনা তদন্ত করা দরকার বলে স্থানীয় মানুষরা মনে করছেন।

উল্লেখ্য, ঘটনাস্থল থেকে ১ কিলোমিটার দূরে রেল লাইন রয়েছে এবং সুজাপুর কালিয়াচকের মজমপুর এলাকায় হামেশায় মুড়ি মুড়কির মতো বোমা ফাটিয়ে দুষ্কৃতীরা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। স্থানীয় ঘোষ সম্প্রদায়কে মারার জন্য এই বোমাগুলি তৈরি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে নাশকতার ছক থাকা কিংবা বর্ধমান কাণ্ডের সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্ত করালেই জানা যাবে। কেননা সি. আই. ডি. কিংবা জেলাপুলিশ এই ঘটনাকে খাটো করে দেখাবে বলে অনেকের আশঙ্কা। তবে বাংলাদেশের কোনো নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে এই বিস্ফোরণের যোগ উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে গত ১২ অক্টোবর রাতে মালদা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায় বাজাপ্তিপাড়া গ্রাম বোমা বিস্ফোরণের তীব্র আওয়াজে কেঁপে ওঠে।

স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও একাধিক মামলায় অভিযুক্ত কামাল শেখের বাড়িতে এই বিস্ফোরণ ঘটে। কামাল এখন পলাতক। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে স্থানীয় মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করছে।

সুভাষগ্রামে প্রতিমা ভাঙচুর

সংবাদদাতা।। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর-রাজপুর মিউনিসিপ্যালটির কাছে সুভাষগ্রামের 'পেটোয়া' গ্রামে ৩৫ বছরের পুরানো একটি শিব-তারা মন্দির রয়েছে। মন্দিরে কালিমূর্তির অধিষ্ঠান। গত ৭ অক্টোবর মন্দিরে বসে একদল মুসলমান দুষ্কৃতী গোমাংস-সহ মদ খাওয়ার সময় জনৈক হিন্দু এর প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতীরা দলবল নিয়ে এসে মন্দিরের ক্ষতিসাধন করে ও কালী প্রতিমার মাথা ভেঙ্গে দেয়। এই ঘটনায় হিন্দুরা তীব্র প্রতিবাদ জানালেও কোনোরকম পুলিশি তৎপরতা দেখা যায়নি। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার নিতাই মণ্ডল রাতরাতি শুদ্ধিকরণ ব্যতিরকে মূর্তি প্রতিস্থাপন করে। এই তৃণমূল নেতা মন্দিরে হিন্দুদের খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে হিন্দুদের চরম অপমান করার ব্যবস্থা করে। পুলিশ হিন্দু সংগঠনগুলোর উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং জায়গা ছাড়তে বাধ্য করে। প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে হিন্দু সংগঠনের কর্মীরা যখন একত্রিত হয় সেখানেও পুলিশ এসে উপস্থিত হয়। এই মুসলমান দুষ্কৃতকারীরা হলো— (১) নুরে আলম মণ্ডল, (২) গফুর মোল্লা, (৩) মোল্লা ভোলা ও (৪) হান্নান মোল্লা। প্রায় চার বছর আগে এরাই দুর্গা মূর্তি ভেঙেছিল। কিন্তু পুলিশ এদের গ্রেফতার করেনি। স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ, প্রায়ই ওখানে হিন্দু বিরোধী ইসলামিক ক্যাসেট বাজানো হয়।

উত্তর দিনাজপুরে অপবিত্র কালী মন্দির

সংবাদদাতা॥ গত ১১ অক্টোবর রাতে উত্তর দিনাজপুর জেলার কানকি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মজলিশপুর মোড়ে কালী মন্দিরে আপত্তিকর বস্তু দেখতে পেয়ে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকার হিন্দু বাসিন্দাদের মধ্যে। যদিও কে বা কারা সেটা ফেলে গিয়েছে তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে

কালী মন্দিরের ভেতরে ফেলে রাখা গোমাংসের টুকরো।

পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ওই আপত্তিকর বস্তুটি দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। এই খবর মোবাইল মারফত ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জায়গায়। খবর জানাজানি হতে আশেপাশের গ্রাম থেকে হিন্দুরা ছুটে আসে। মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা হিন্দুরা রাস্তা অবরোধ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থল ৩১নং জাতীয় সড়ক লাগোয়া হওয়ায় বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাক দাঁড় করিয়ে একটি ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে শিলিগুড়ি থেকে চিনি বোঝাই ডব্লুবি-৪১ডি/ ০৩৬৯নং ট্রাকটিকে আগুন ধরিয়ে দেয় জনতা। ফলে যানজট সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। অবশেষে দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভায়। ঘটনার খবর পেয়ে আসেন ইসলামপুর মহকুমার এসডিপিও সুবিমল পাল, জেলা পুলিশের অধিকর্তা সৈয়দ ওয়াকর রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেভিড ইমন লেপচা। আসেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা উত্তর দিনাজপুর জেলা সিটুর সাধারণ সম্পাদক সুবীর বিশ্বাস, স্থানীয় সিপিএম নেতা সর্দার অশোক সিং, পরিমল ও রমেশ-সহ স্থানীয় সিপিএম কর্মী ও নেতারা। তাঁরা উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার জন্য এলাকা ঘুরে দেখেন।

অন্যদিকে ঘটনাস্থলের ৮ কিলোমিটার দূরেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রাত্রি সাড়ে ৯টা নাগাদ সুর্যাপুর বাজারের দক্ষিণ দিকে ৩১নং জাতীয় সড়কের পাশে উত্তেজিত জনতা আগুন ধরিয়ে দেয় স্থানীয় এক বাড়িতে। বাড়ির মালিকের অভিযোগ, বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও দুষ্কৃতীরা তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। অন্যদিকে শুক্রবার এই ঘটনার পর পরই ১৪৪ ধারা জারি করে পুলিশ। পাশাপাশি এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখারও আবেদন জানানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

এই ঘটনায় চাকুলিয়া এলাকার ৪ জন ব্যক্তি আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত দুই ব্যক্তি বর্তমানে ইসলামপুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে আটক করেছে। চাকুলিয়ার এই ঘটনা প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মুস্তাফার অভিযোগ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশকে সমস্তটা জানানো সত্ত্বেও তারা সময় মতো পৌঁছায়নি বলেই এমনটা ঘটেছে।

পরলোকে বাণী দাস

আসানসোল শাখার স্বয়ংসেবক অধুনা ব্যাঙ্গালোর নিবাসী হিমাদ্রি দাসের মাতৃদেবী

বাণী দাস গত ২ অক্টোবর ব্যাঙ্গালোরে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৩ পুত্র ১ কন্যা, পুত্রবধূ ও নাতিনাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর অপর দুই পুত্র নীলাদ্রি ও সীমাদ্রিও স্বয়ংসেবক। তাঁর স্বামী প্রয়াত সচ্চিদানন্দ দাস কলকাতার স্বয়ংসেবক ছিলেন।

জামাত-উল-তৃনমূল

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
দিদিভাই,

নতুন করে আপনার অনুগত ভাই হিসেবে নিজের পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। অতীতে অনেক চিঠি লিখে তা বুঝিয়ে দিয়েছি। বারবার বুঝিয়ে দিয়েছি যে, এই পত্র লেখক মনে করে 'দিদিই একমাত্র সত্য'। কিন্তু দিদি তবু আজকে নিজেকে অনুগত ভাই বলে নতুন করে দাবি করতে হল। তার পিছনে একটাই কারণ। আসলে দুর্গা পুজোর পর থেকে লোকজন নিজেকে তৃণমূল পরিচয় দিতেই লজ্জা পাচ্ছে। মনে করছে ওই পরিচয় দেওয়া মানে নিজেকে দেশদ্রোহী হিসেবে তুলে ধরা। কিন্তু দিদি এখনও এই শর্মা আপনার সঙ্গে। আপনার অনুসরণে। তবে কিছু সমস্যা হচ্ছে। রাস্তাঘাটে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না। তাই এই চিঠি লিখে আপনার শরণাপন্ন হতে চাইছি।

সবাই জানে আপনার মানুষ চেনার ক্ষমতা অকল্পনীয়। এক দিব্য চোখে আপনি ভিড়ের মধ্যেও কে মাওবাদী, কে বিজেপি, কে সিপিএম তা চিনে ফেলতে পারেন। এমন ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ আপনি অনেক রেখেছেন। সেই যে মেদিনীপুরে আপনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর এক কৃষকবাড়ির ছেলে শিলাদিত্য আপনাকে কীসব প্রশ্ন করেছিল। অত মানুষের মধ্যে আপনি ঠিক চিনে ফেলেন যে মাওবাদী কর্মী ভিড়ে মিশে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইছে। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। বেশ কিছু মামলাও ঠুকে দেয়। এরপর কামদুনিতে ভিড়ের মধ্যে থেকে দুই মহিলা প্রতিবাদীকে আপনি মাওবাদী হিসেবে শনাক্ত করেন। এক জাতীয় টিভি চ্যানেলের লাইভ অনুষ্ঠানেও কথায় কথায় প্রশ্ন তোলা তানিয়া ভরদ্বাজ নামে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী যে মাওবাদী তা আপনি বলে দিয়েছিলেন। সেইবার গোটা দেশ আপনার সেই 'এক্স-রে' মার্কা চোখ দেখে চমকে গিয়েছিল। বাহবা দিয়েছিল। আমি হাততালি দিয়েছিলাম আনন্দে। কিন্তু এত সুন্দর আপনার চোখ একবার দেখতেও পারল না যে আপনার মনোনয়ন পেয়ে সাংসদ হওয়া ইমরান খান আসলে দেশবিরোধী হিসেবে অভিযুক্ত নিষিদ্ধ মৌলবাদী সংগঠন সিমির প্রতিষ্ঠাতা? এমন সব প্রশ্ন উঠছে। কী উত্তর দেব দিদি?

তারা বলছে, আপনি নাকি সব জানতেন। কারণ, আমিও বিশ্বাস করি মানুষ চিনতে আপনার ভুল হয় না। আমি আপনার ক্ষমতাকে বিশ্বাস করি। তবে কি এটাও বিশ্বাস করব যে সংখ্যালঘু ভোটের পরিবর্তে ইমরান খানকে ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছে দেওয়াটা মৌলবীদের শর্ত ছিল? ইমাম ভাতা, মাদ্রাসা উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে জঙ্গি প্রশিক্ষণের জন্য রসদ জোগানোটা আসলে শর্ত পূরণের চেষ্টা?

মুসলিম তোষণ করেন বলে আপনার বিরুদ্ধে সবসময়ই বিরোধীরা সরব। এই রাজ্যে আপনার ক্ষমতার পিছনে সংখ্যালঘু ভোট যে একটা বড় সহায় সেটা অবশ্য অভিযোগ নয়, পরিসংখ্যানগত ভাবে সত্য। লোকসভা ভোটের আগে শাহি ইমাম তো ঘোষিতভাবে তৃণমূলকে সমর্থনের জন্য আহ্বান জানান। আপনার দলের নেতারা এবং আপনি নিজে বিভিন্ন সময় ছোট, বড় মেজ, সেঝ ইমাম, মৌলবীদের কাছে অনেক ভেট চরিয়েছেন। নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণের জন্য ইমামের বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিল্লি ছুটে গেছেন। এখন সবাই বলছে, আসলে দেওয়া-নেওয়ার হিসেব কষতেই আপনার এই ইমাম ঘনিষ্ঠতা, এমন সংখ্যালঘু গত প্রাণ। এসব কি বিশ্বাস করব দিদিভাই?

রমজান মাসে পঞ্চায়েত ভোট করা যাবে না বলে আপনি যখন কান্নাকাটি করেছেন তখনও নাকি আসলে ভোট এবং ভেটের হিসেব কষেছিলেন বলে এখন সবাই মনে করছে। আমি বুঝতে পারছি না কোনটা কোনটা বিশ্বাস করব। মুর্শিদাবাদের সদ্য অপসারিত পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবীর যে আপনার প্রিয়পাত্র সেটা সবাই জানে। আর তাতেও লোকে দোষ খুঁজছে দিদি। গত রমজান মাসে মুর্শিদাবাদের সব থানায় নজির গড়ে ইফতার পার্টি হয়। আর পবিত্র ঈদের দিন জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জেলার সব ইমাম মৌলবিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় ফুল ও মিষ্টির সওগাত। সবটাই সরকারি কোষাগারের অর্থে। সেই সওগাত পাওয়া বেলডাঙার এক ইমাম ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ অর্থাৎ বেআইনি

আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক মজুত ও কেনাবেচার অভিযোগ। না সব ইমামই এমনটা করেন তা হয়তো নয়, কিন্তু একটা ভাত টিপেই যা নমুনা পাওয়া গেল তাতে বেশ ভয় ভয় করছে। দিদি আমি কি ভয় পাব? নাকি আপনার ওপর বিশ্বাস অবিচল রাখব?

ইতিমধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক কেনাবেচার অভিযোগে মুর্শিদাবাদে গ্রেফতার হয়েছেন এক মাদ্রাসা শিক্ষক। বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে এমন অনেক মাদ্রাসার কথাই উঠে আসছে যেখানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ হত। সবাই বলছে দিদি আপনি নাকি সব জানতেন? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু দিদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনি কি সত্যিই এসব খবর জানতেন না? নাকি এসব জেনেও চুপ করে থাকাটা ছিল সংখ্যালঘু ভোট পাওয়ার শর্ত?

অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়ছে। ২২ জানুয়ারি, ২০০২। তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। শিলিগুড়িতে এক সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলেছিলেন, তিনি রাজ্যের সমস্ত অননুমোদিত মাদ্রাসা বন্ধ করে দিতে চান। কারণ, তার অনেকগুলিই আসলে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের কেন্দ্র। এরপর রাজ্যে বিরোধিতার ঝড় বয়ে যায়। ছিঃ ছিঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদাদের স্কুল নিয়ে এত বড় সন্দেহ! সত্যি হলেও কি বলা উচিত?

বুদ্ধবাবুর দল সিপিএমও মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়ালো না। শেষে বক্তব্য ফিরিয়ে নিয়ে একটা বোকা বোকা সাজানো কথা বলেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে সেদিন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই রাজ্যে আইএসআই কেন্দ্র হিসেবে মাদ্রাসা কাজ করলেও ভোটের স্বার্থে তা চলতে দিতে হবে। দেশবিরোধী কার্যকলাপের বীজ বুনতে দিতে হবে।

কিন্তু দিদি, আপনি সেকাজ করতেই পারেন না। আমি বিশ্বাস করি না। তবু ভয় করছে দিদি। এনআইএ তদন্ত করে কেঁচোর বদলে কেউটে বের করবে না তো! লোকে আজকাল বলছে আপনার দলটা আসলে জামাত এ তৃণমূল। শেষ পর্যন্ত দলটা থাকবে তো দিদিভাই? জঙ্গি যোগের একের পর এক যা প্রমাণ মিলছে তাতে দলটা শেষে জঙ্গি দল হয়ে যাবে না তো?

—সুন্দর মৌলিক

গত ১৩ অক্টোবর 'গোর্খাল্যান্ড টেরিটোলিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' এবং লক্ষ্মীবাঈ সেবা ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে দার্জিলিংয়ে ভগিনী নিবেদিতার ১০৩তম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি, দার্জিলিংয়ের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রধান শান্তাক্কাজী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত। — *ছবি : বাসুদেব পাল*

ভারতের মাটিতে মোগলিস্তান গঠনই জেহাদিদের লক্ষ্য

বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণে গুরুতর আহত জঙ্গি আবদুল হাকিম তদন্তকারী গোয়েন্দা অফিসারদের বলেছে, 'আমি জেহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কাজ করেছি।' কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ) সূত্রে জানা গেছে বাংলাদেশের জেহাদি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন অসম এবং পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে নাশকতা চালানোর নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। অসমে এদের দোসর আলফার জঙ্গিরা। সাম্প্রতিককালে অসমের বড়োল্যান্ডে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার পিছনে যে জামাতের মদত ছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্টে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ভারতে বাংলাদেশী জামাতের (জে এম বি) নাশকতার সহযোগী সংগঠন প্রধানত দুটি। হিফাজত-ই-ইসলামি এবং আহ্‌লে হাদিস। খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে যুক্ত ছিল আহ্‌লে হাদিস। এখনও পর্যন্ত এই বিস্ফোরণকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের অনেকেই স্বীকার করেছে যে তারা আহ্‌লে হাদিসের আদর্শে বিশ্বাসী। ভারতের ১৯টি রাজ্যে এই জেহাদি সংগঠনের নাশকতার জাল ছড়িয়েছে। পুণের জার্মান বেকারি বিস্ফোরণ এবং পাটনা বিস্ফোরণেও আহ্‌লে হাদিস জঙ্গিরা জড়িত ছিল।

সম্প্রতি এই সংগঠন তার নাম পাল্টে নিজেদের জামিয়াতে আহ্‌লে হাদিস বলে প্রচার করছে। খাগড়াগড়কাণ্ডে যে সব প্রচারপত্র গোয়েন্দারা পেয়েছেন সেখানে ওই নয়া পরিচয় জানা গেছে। প্রচারপত্রে বলা হয়েছে অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশের কিছুটা অংশ দখল করে ভারতের মাটিতে স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র গড়াই তাদের লক্ষ্য। বিগত দুই দশক ধরে ভারতের মাটিতে স্বাধীন মোগলিস্তান গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে দেশের ছোট বড় সব মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন। অনেকটা একই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করছে সুন্নি মুসলমান সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইসলামিক স্টেট ফর ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া। সংক্ষেপে আই এস আই এস। এদের হিংসা ও বর্বরতা বিশ্বের সভ্য সমাজের কলঙ্ক। এরা পৃথিবীকে চেঙ্গিস খান, তৈমুর লংয়ের নৃশংসতার যুগে নিয়ে যেতে চায়।

বাংলাদেশী জামাত বা জে এম বি পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ১ লক্ষ জেহাদিকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা সরকারের

গূঢ়পুরুষের কলম

মুসলমান তোষণ নীতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশী জঙ্গিরা মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, মালদা, দুই ২৪ পরগনা এবং বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া নদীয়া জেলায় আস্তানা গেড়েছে। এই লক্ষাধিক অনুপ্রবেশকারীরা ২০১২ সাল থেকে ধীরে ধীরে ঢুকেছে। এরা সকলেই জামাতের আত্মঘাতী জঙ্গি স্কোয়াডের সক্রিয় সদস্য। সিপিএমের তিন দশকের রাজত্বে অবাধ অনুপ্রবেশ চলেছে। তবে গত দুই বছরে জামাতের জঙ্গিরা যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। এর কারণ, বাংলাদেশে জামাতকে নিষিদ্ধ সংগঠন ঘোষণা করে শেখ হাসিনা সরকার কড়া পদক্ষেপ নেওয়ায় জামাত নেতৃত্ব তার সদস্যদের পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে পাঠিয়েছে। একদা সিপিএম যেমন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভোটের লোভে জামাই আদরে বরণ করতো, ঠিক সেই চেনা পথটি এখন অনুসরণ করছে তৃণমূল। ভোটের সময় জামাতের হিংস্র সদস্যরা বোমা বন্দুক নিয়ে গ্রাম বাংলায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ছাপ্পা ভোটের ব্যবস্থা করে দেবে। এইভাবেই সিপিএম ভোটে জিতেছে। তৃণমূলও কম্যুনিস্টদের দেখানো পথে চলেছে। তৃণমূল ধরে নিয়েছে যে ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট কব্জা করতে পারলেই কেল্লা ফতে। বাকি ৭০ শতাংশ হিন্দুদের ভোটকে তারা অজা-গজাদের ভোট বলে পাত্তা দেয় না। সবাই জানে যে মুসলমান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুরা কোনওদিনই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ করতে পারেনি। হিন্দুদের মধ্যে যত ছদ্মসেকুলার বুদ্ধিজীবী আছে তার ভগ্নাংশও মুসলমানদের মধ্যে নেই।

বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য অসমে গণআন্দোলন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হয়নি। অসম সরকার অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যবস্থা নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ৪০ বছরে অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রাথমিক স্তরেও চিন্তা ভাবনা করেনি। উল্টে অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে উৎসাহ দিয়েছে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা হৈহৈ করে মাঠে নেমে প্রচার করেছে যে ওরা দরিদ্র মানুষ। অন্ন বস্ত্র আশ্রয়ের জন্য ভারতে ঢুকেছে। দরিদ্রের ধর্মীয় বিভাজন হয় না। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। অনুপ্রবেশকারীরা যদি দরিদ্রই হয় তবে তারা যেখানে আস্তানা গেড়ে বসেছে সেখানেই মসজিদ আর মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে কাদের টাকায়? গত তিন বছরে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলায় ৩৯টি ঝাঁ-চকচকে মসজিদ তৈরি হয়েছে। মসজিদ তৈরির এতো টাকা এল কোন সূত্র থেকে। এর পিছনে কারা আছে। খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তরত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন যে এর পিছনে আছে জামাতে ইসলামি এবং তার শাখা সংগঠনগুলি। হ্যাঁ, খাগড়াগড় বিস্ফোরণে আহত জঙ্গি আবদুল হাকিমের দাবি সে আহ্‌লে হাদিসের সক্রিয় সদস্য। উগ্রপন্থার মাধ্যমে মুসলমান শরিয়ত রাজ রাষ্ট্রের পত্তনে তারা কাজ করে। এরপরেও আজাদ সাহেবরা আমাদের বিশ্বাস করতে বলবেন যে জামাতে ইসলামি, তবলিকি জামাত, হিফাজত-ই-ইসলাম, আহ্‌লে হাদিস, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন সংগঠনগুলি শুধুই ধর্মচর্চা করে। তৃণমূল নেত্রী কি বলবেন? তিনি কি কানে তুলো এবং চোখে ঠুলি দিয়েছেন?

দেশের নবনির্মাণের জন্য সারা সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে : মোহন ভাগবত

এক বছর পরে আবার আমরা বিজয়াদশমী উৎসব উপলক্ষে একত্রিত হয়েছি। কিন্তু এ বছরের পরিবেশ যে একটু ভিন্ন ধরনের তা আমরা সবাই অনুভব করতে পারছি। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের প্রথম প্রয়াসেই 'মঙ্গল যান' সফলভাবে মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। ফলে পৃথিবীর মধ্যে ভারত এক গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলো, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস চরমভাবে বৃদ্ধি পেল। মঙ্গল অভিযানের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও সঙ্গে যুক্ত সবাইকে আমরা হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এরকমই দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়াড খেলায় পদক জয় করে দেশের গৌরব বৃদ্ধিকারী সমস্ত খেলোয়াড়কেও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ বছর রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ী জীবনগাথার সহস্রাব্দী বর্ষ। এ বছর পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শনের পঞ্চাশতম বর্ষও চলছে। আমরা এ বছর পৃথিবীকে উপলব্ধি করাতে সমর্থ হয়েছি যে ভারতবর্ষের সাধারণ সমাজ পৃথিবীর তথাকথিত উন্নত রাষ্ট্রের মতো সুখসুবিধাসম্পন্ন ও শিক্ষিত জনতার থেকে বেশি না হলেও সমানভাবে অত্যন্ত পরিপক্ক বুদ্ধিতে দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে নিজেদের গণতান্ত্রিক কর্তব্য পালন করে থাকে। এই আত্মোপলব্ধির কারণে পৃথিবীর দেশগুলিতে ভারতবাসীর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ গৌরববৃদ্ধি এবং সমস্ত ভারতীয়র মনে ধৈর্য, উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাসের স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে। ভারতের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকরা ভারতের প্রতি যে উৎসাহ ও সঙ্কল্প প্রদর্শন করছেন তাও আগামীদিনে গৌরবশালী ও বৈভবময় ভারত নির্মাণের পক্ষে এক শুভ সঙ্কেত দিচ্ছে।

কিন্তু আমাদের এটাও জেনে ও বুঝে চলতে হবে যে, পৃথিবীতে সুখ, শান্তি ও সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে চলা নতুন ব্যবস্থার স্বয়ং উদাহরণ হয়ে ওঠা ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরু নির্মাণ করার এই অভিযানের এটা একটা ছোট্ট পদক্ষেপ মাত্র। এখনো অনেক কিছু করা, লক্ষ্যে পৌঁছনোর দীর্ঘ পথ বাকি আছে। পৃথিবী ও দেশের পরিস্থিতি যদি নিকট থেকে অনুধাবন করা যায় তাহলে যে কেউ এটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে প্রেম ও সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করা, প্রকৃতির সঙ্গে ও পরস্পর ব্যবহারে সামঞ্জস্য বিধান, সহযোগিতা, পরস্পর সহমর্মিতা ও আদান প্রদানের ভিত্তিতে চলা এবং ভাবনাচিন্তা, মতাদর্শ, আচরণে চূড়ান্ত কট্টরতা ও হিংসা ত্যাগ করে অহিংসা ও ন্যায়নীতির পথ অবলম্বন করার ফলেই সারা বিশ্বের মানবজাতির সুখশান্তিপূর্ণ সুন্দর জীবনযাপন সম্ভব হবে। এই সত্যের বৌদ্ধিক প্রচার যা বিশ্বের ইতিহাসে শুরু থেকেই ছিল, তা এখন পর্যাপ্ত মাত্রায় হচ্ছে। চিন্তাস্তরে সবাই এটা অনুভব করছেন। কিন্তু প্রতিদিনের কথাবার্তা ও উপদেশে এই উদাত্ত, শ্রেষ্ঠ ও হিতকারক তত্ত্ব পালনের জন্য কোনো সুসঙ্গত আচরণ দেখা যাচ্ছে না। পরস্পর ব্যবহারে ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত আচরণ ও নীতির মধ্যে দম্ভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, সঙ্কুচিত মনোভাব ইত্যাদিরই বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে। এসবের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আধুনিক মানবজাতির বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, কারিগরী জ্ঞান ও সুখসুবিধা আগের থেকে অনেক উন্নত হওয়ার পরেও পৃথিবীতে মানুষের জীবন থেকে দুঃখ, কষ্ট, শোক ইত্যাদি দূর করার সমস্ত রকম প্রয়োগ গত দু' হাজার বছর ধরে করার পরেও একই সমস্যা বারবার এসে পড়ছে। মানুষের এই তথাকথিত প্রগতি আরো কিছু নতুন দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

এজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গত কয়েক বছর ধরে পরিবেশ বিষয়ে চর্চা সর্বত্র চলছে। তবুও প্রতিটি বিগতদিন পরিবেশ দূষণের দিকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে পরিবেশ দূষণের কারণে নিত্যনতুন ও বিচিত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়তে হচ্ছে। তবুও প্রচলিত বিকাশের নামে বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলির নীতিতে শব্দের ফুলঝুরি ও ভালো ভালো কথার অতিরিক্ত কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। তাদের সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে ওই পুরাতন, একেবারে জড়বাদী, ভোগবাদী ও স্বার্থান্বেষী চিন্তাধারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

এসব সম্মিলিত স্বার্থের কারণে শোষণ, দমন, হিংসা ও কট্টরতার উদ্ভব হয়। এরকমই স্বার্থের কারণে মধ্য-পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমি দেশগুলির যে ক্রিয়াকলাপ চলে তার মধ্যে থেকে মৌলবাদের নতুন অবতার আইসিস (ISIS) রূপে সারা পৃথিবীকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। বিশ্বের সমস্ত দেশ বহু পন্থ-সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী এই সঙ্কটের বিরোধিতায় এক ঐক্যবদ্ধ শক্তি দাঁড় করানোর চিন্তাভাবনা করছে এবং করবেও; কিন্তু বারবার রূপ বদল করে আসা এই সন্ত্রাসবাদ যে প্রকৃতি ও ভোগসর্বস্ব স্বার্থের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চক্রে জন্মগ্রহণ করছে, সেই চক্রের গতিকে মূলোৎপাটন করে বিনাশ করা ছাড়া পৃথিবীতে শত বছর ধরে চলে আসা সন্ত্রাসবাদের সঙ্কটের ধারা সমূলে ধ্বংস করা যাবে না।

যাঁরা এসব করতে চান তাঁদের প্রথমে স্বার্থ, ভয় থেকে মুক্ত হয়ে ভৌতিক জড়বাদকে মন থেকে মুছে ফেলে এক সঙ্গে সবার সুখবিধানকারী একাত্ম ও পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৈশ্বিকরণের নামে কেবলমাত্র নিজের গোষ্ঠীর আর্থিক স্বার্থ দেখা ও পরস্পর শান্তি স্থাপনের কথার আড়ালে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা অথবা নিরস্ত্রীকরণের নামে অন্য দেশকে দুর্বল করে রাখার চেষ্টা সুখী ও সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্নকে কখনো বাস্তবায়িত করতে চাইবে না এবং করবে না।

পৃথিবীর গত হাজার বছরের ইতিহাসে

ফঃ ২

সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে এই দিশায় চলা বিশ্বাসযোগ্য প্রয়াসের উদাহরণ কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই আছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত দু'দিকে বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে যে সনাতন চিরন্তন রাষ্ট্রীয় চেতনা প্রবাহ বিদ্যমান তা 'হিন্দুত্ব' নামে পরিচিত। এর বৈশিষ্ট্য এটাই যে, ভাষা, প্রান্ত, পন্থ-সম্প্রদায়, জাতি- উপজাতি, খাওয়া-দাওয়া, রীতি-নীতি ইত্যাদির সমস্ত স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে সম্মানপূর্বক মেনে নেয় এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সারা বিশ্বের কল্যাণের জন্য রত থাকে। এখানে জীবনজিজ্ঞাসার অন্বেষণ, অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান। এখানে কারো বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করা হয় না, কারো বিগ্রহ ভাঙার অভিযান চালানো হয় না, কারো পুঁথি-নির্ভর ব্যবস্থার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বা তার শ্রদ্ধার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এই পরম্পরার নেই। বৌদ্ধিকস্তরে মতচর্চার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলেও ব্যবহারিক স্তরে বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে সম্মান করে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মাধ্যমে এক সমাজরূপে চলা হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষণ। প্রাচীনকাল থেকে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ঋষি, মুনি, ভিক্ষু, শ্রমণ, সন্ত, বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞরা মেক্সিকো থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত গেছেন। কারো সাম্রাজ্য দখল করে নয়; কারো জীবনপদ্ধতি, উপাসনা পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় অথবা সাংস্কৃতিক পরিচয় ধ্বংস করে নয়, প্রেমের দ্বারা আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করে মঙ্গল ও কল্যাণের ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করে সেখানকার সমাজ জীবনকে অধিক উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন। আধুনিককালেও আমাদের মনীষী থেকে সাধারণ প্রবাসী ভারতীয়রা একই আচরণ করে চলেছেন। এজন্য সারা পৃথিবীর দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা দেখছেন ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য এবং জগতের জন্যও এই ভারতে এক আশার কিরণ দেখা দিয়েছে।

একজন কবি ভারতীয় চেতনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—

'পৃথিবীর বুভুক্ষু সন্তান—
আমি আপন বুকের রক্ত করিয়াছি পান।
দেশ দখল করিতে নয়—
শতশত মানব হৃদয় করিতে জয়
করিয়াছি আমি নিশ্চয়।'

এই চেতনা সারা পৃথিবীকে আমরা দিয়েছি। এজন্য বিশ্ব আমাদের কাছে আশাও করে। এক রাষ্ট্ররূপে ভারতের এই চিরন্তন অস্তিত্ব এজন্যই প্রয়োজন। আমাদের ঋষি-মুনি বিশ্বকে ডাক দিয়ে বলেছেন—

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্ব মানবাঃ।।

এজন্য আজ বিজয়াদশমীর পুণ্য দিনে আমাদের সামনে বিজয়ের এই সীমারেখা স্পষ্ট যে, সারা বিশ্বের পথপ্রদর্শক রূপে ভারতকে দাঁড় করাতে হবে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে এরকম নির্মাণ করতে হবে, যা সারা বিশ্বের প্রতি একাত্ম, ভেদভাবরহিত, স্বার্থশূন্য দৃষ্টিভঙ্গি রেখে সর্বসমর্থ ও সর্বাঙ্গসুন্দর সমৃদ্ধ রূপে দাঁড়াতে পারে। বিশ্বচরাচরের সমস্ত বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে সমন্বয়ের ভিত্তিতে চলতে উদাহরণস্বরূপ হয়। সেখানে সম্পন্নতার সঙ্গে সুনীতি থাকবে; করুণা, সেবা, পরোপকার ও নির্ভয়তার সঙ্গে অজেয় শক্তিসম্পন্ন হবে; যার বিকাশপথ সর্বত্র মঙ্গল সৃষ্টি করবে— এরকম ভারত আমাদের নির্মাণ করতে হবে। যে ভারতের সুপুত্ররা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন, সেই সেই দেশের লোকের সম্মুখে সৌজন্য, চরিত্রবল ও উদারতার উদাহরণ স্থাপন করছেন, যাঁরা ভারতভূমি, ভারতের সংস্কৃতি ও পূর্বপুরুষদের আপনার মনে করছেন তাঁরা যেন নির্ভয় ও সুরক্ষিতভাবে জীবনযাপন করতে পারেন এরকম ভারত আমাদের নির্মাণ করতে হবে।

কিছুদিন আগেই এরকমই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারতের জনসাধারণ শাসন ক্ষমতায় এক বড় পরিবর্তন এনেছেন। এই পরিবর্তনের এখনো ছ'মাস পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এরকম সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ভারতের উত্থানের এবং ভারতবাসীর আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব সরকারি নীতিতে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। খুব কম সময়ের মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা আর্থিক, সুরক্ষা, বিদেশ নীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশের মঙ্গলের জন্য যে কতিপয় নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। এই দিশায় আগামীদিনে সঠিক পথে দেশের নীতি সুনিশ্চিত ও সুব্যবস্থিত হয়ে চলতে পারে তা এই সরকারকে করতে হবে। এর জন্য আশা ও বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের বেশ কিছু সময় প্রতীক্ষা করতে হবে।

বিগত দিনগুলিতে দেশের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে জম্মু- কাশ্মীরে যে ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসেছিল তাতে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে প্রাণ হারানো মানুষদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ব্যক্ত করছি। জম্মু-কাশ্মীরের অকল্পনীয় বন্যায় সহযোগিতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে তৎপরতা ও উদার মনে সর্বপ্রকার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তা খুবই প্রশংসনীয়। প্রতিবারের মতো অন্যান্য সামাজিক সংস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও সেবা ভারতীর কার্যকর্তারাও দ্রুত উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং আবশ্যক সহায়তার যোজনা তৈরি করেছিলেন। এরকম বিপদের সময় সমস্ত রকম ভেদ ভাবের ঊর্ধ্বে উঠে সহায়তার জন্য তৎপর হওয়াই ভারতবর্ষের চিরন্তন সামাজিক সংবেদনা ও রাষ্ট্রীয় একতার পরিচয় দেয়।

কিন্তু বর্তমানে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি খুবই গম্ভীর ও জটিল। কেবল শাসনক্ষমতা ও রাজনীতির ভরসায় দেশের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিলে চলবে না। বিশ্বের প্রচলিত সমস্ত মতাদর্শ নষ্ট ও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। আমাদের দেশের ব্যবস্থা ও নীতি রূপায়ণেও স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত সেই প্রভাব রয়ে গেছে। একাত্ম রাষ্ট্র রূপে দাঁড়ানোর জন্য সমাজে আবশ্যক বিশ্বাসযোগ্যতার, প্রেমপূর্ণ আত্মীয়তার, উদ্যম, নিষ্ঠা, সংস্কার প্রবণতা ইত্যাদি সদ্‌গুণগুলি গত একশত বছর ধরে নষ্ট হয়ে এসেছে, এখনো তা আটকানো যায়নি। নিজেদের সঙ্কুচিত স্বার্থের জন্য এসব খামতিগুলিকে টেনে এনে, বাড়িয়ে, ভেদাভেদকে ইন্ধন জুগিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে দেশি ও বিদেশি শক্তিগুলি আজও বিদ্যমান। তারা তাদের খেলা খেলে চলেছে। এজন্য দেশের প্রশাসন পরিচালকদের সজাগ, সতর্ক থাকতেই হবে। প্রচলিত বিকাশপথের ভালো দিকগুলি গ্রহণ করে এক নতুন সময়োপযোগী পথের নির্মাণ

করতে হবে। একাত্ম ও সম্যক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থেকে প্রচলিত বিকাশপথের ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলি পরিত্যাগ করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে উন্নয়নের নতুন ক্রম খাড়া করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী রামতীর্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকমান্য তিলক থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বীর সাভারকর, ড. আম্বেদকর, পূজনীয় বিনোবাভাবে, সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর), শ্রীরামমনোহর লোহিয়া, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রমুখ মহাপুরুষ তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই দেশের শিক্ষা, সংস্কার, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সুরক্ষানীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে গভীর, একাত্ম, মৌলিক ও ব্যবহারিক চিন্তন করেছেন তার অনুশীলন ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতায় নির্মিত এক সময়োচিত উন্নয়নের পথ দেশের শাসনব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের শেষ সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা শেষ মানুষটির জীবনের স্থিতিও এই দেশের উন্নতির মানবিন্দু প্রমাণিত হবে এবং দেশের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির অনিবার্য অনুঘটক হবে আত্মনির্ভরতা— এটা মনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশের একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং সেই আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বের মধ্যে অগ্রণী দেশ তৈরি হয়ে শত শত বৎসর জগতের নেতৃত্ব প্রদানকারী আমাদের দেশ ছিল— এটা সতত মনে রেখে চলতে হবে। সেই দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করার ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে। এর সময়োপযোগী প্রয়োগ সরকারি নীতিতে প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

এরকম নীতির দ্বারা দেশকে যেভাবে নির্মাণ করার আকাঙ্ক্ষা আমাদের সংবিধানে দিকনির্দেশ করা আছে সেদিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করতে হবে, এই আশা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সরকার তার কাজ করবে এজন্য তাদের সময় দিতে হবে।

কিন্তু এর সঙ্গেই সমাজের সহযোগিতা ছাড়া কেবলমাত্র সরকারের প্রচেষ্টায় দেশের পরিবর্তন সম্ভব হয় না— বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশের উন্নতির ইতিহাস এ কথাই বলে। এজন্য সমাজ ও সমাজের উন্নতি করতে সমাজের জাগরণ প্রয়োজন। গণতন্ত্রে তার সক্রিয়তা, সজাগতা ও সমাজের রাষ্ট্রহিতকারক উদ্যমের কারণেই সরকারি নীতি সফল করতে সরকার সহযোগিতা পায় এবং ক্ষমতার রাজনীতিতে দেশ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বেঁচে যায়।

এরকম সব ব্যক্তি, সংস্থা বা সংগঠন দুর্নীতি দূরীকরণের কাজে নিজেদের সংস্থাগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রহিতের জন্য কাজ করেন। সরকার ও শাসনব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উন্নয়নের লাভ শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছনো বা না পৌঁছনো, তার প্রশ্ন সরাসরি সরকার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার আবশ্যকতা গণতান্ত্রিক দেশে সবসময় ক্রিয়াশীল থাকে।

দেশের উন্নয়নে উপরোক্ত সহযোগিতার আবশ্যকতা বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব ও জটিলতা দেখে মনে আসছে। দেশের দক্ষিণ অংশে কেরল ও তামিলনাড়ু রাজ্যে জেহাদি কার্যকলাপ মারাত্মকভাবে বেড়েছে। ওইসব কার্যকলাপ প্রতিরোধে যেমন, বিরল খনিজের চোরাচালান বন্ধের কোনো উদ্যোগই গুরুত্বসহকারে নেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে অনুপ্রবেশ অথবা অন্য কারণে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, ভোটের জন্য বিশেষ সম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে তোষণের কারণে সেখানকার হিন্দুসমাজের জীবনযাত্রা ও দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থা ভীষণভাবে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। সমগ্র দেশেই দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানো জেহাদি ও মাওবাদীশক্তি এবং তাঁদের মদতদাতাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের পক্ষে কোনো প্রভাবী যোজনা গ্রহণ এখনো চোখে পড়ছে না। কিন্তু এর জন্য সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এইসব সমস্যার প্রতি সমাজের অধিক সজাগ থাকা প্রয়োজন। সীমান্তের দু'দিকেই চলা বহু প্রকার দুষ্কর্মে লিপ্ত লোকেরা তো সমাজেই বাস করে। বিনা অনুমতিতে অনুপ্রবেশ করা লোকেদের রোজগারে সাহায্য ও আশ্রয়দান সমাজের সাধারণ লোকেরাই করে থাকে। সমাজে শোষণ ও উন্নতির অভাবের কারণে মাওবাদী জঙ্গিরা গরিব যুবকদের কামানের খাদ্য (cannon fodder) হিসাবে ব্যবহার করছে। শোষণ দূরীকরণ ও উন্নয়নের লাভের জন্য যেমন সরকারের তৎপরতা, পারদর্শিতা, সংবেদনশীলতা এবং নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজন আছে, তেমনিই ওইরকমই এই সবের মধ্যে সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা, নিজস্ব আলাদা কর্মসূচির মাধ্যমে শোষণ দূরীকরণের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কর্মরত থাকা এবং উন্নয়নকে সমাজের অভাবগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছনোর জন্য ধাপে ধাপে সেবাকাজ শুরু করাও খুবই জরুরি। সরকারের নীতি দেশকে আত্মনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাওয়াই হোক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উদ্যোগে বৃদ্ধি হোক; সস্তা পেলেও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য, এমনকী ঠাকুর-দেবতার মূর্তিও বিদেশি কেনার প্রবৃত্তি সর্বসাধারণ লোক ত্যাগ করে জীবনে স্বদেশী আচরণ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের সজাগ ও শক্তিশালী নীতি রূপায়ণ এবং সেনাবাহিনীর পূর্ণ তৎপরতা ও পরাক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের জাগ্রতভাব, ব্যক্তিচরিত্র ও দেশভক্তিও সুনিশ্চিত করে থাকে। সমাজের সহযোগিতা সরকার ও সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে। সেনাবাহিনীতে সেনা ও সেনা-অফিসার পর্যাপ্ত মাত্রায় সমাজের যুবসমাজ থেকে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের চোখ-কান সমাজে চলতে বিভিন্ন গতিবিধি সম্পর্কে সবসময় খোলা থাকে তার প্রয়োজন আছে। দেশ থেকে গোমাংস রপ্তানি এবং গবাদিপশু চোরাচালানের ওপর শীঘ্র প্রতিবন্ধকতা লাগানোর খুবই প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

কিন্তু সমাজের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কি আশ্বস্ত থাকতে পারি? আমরা কি আমাদের পরিবারের শিশু-বালকদের বাড়ির পরিবেশে উপযুক্তভাবে সংস্কারিত করতে পারছি? বাড়ির অভিভাবকরা ভালো সংস্কারের জন্য উপযুক্ত আচরণ করে থাকেন? বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে মাদক ব্যবহারের রমরমা, উদ্ধত আচার আচরণ ও কথাবার্তা প্রমাণ করছে দিন দিন সংস্কারের অবনমন হচ্ছে। 'মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু চ লোষ্টবৎ, আত্মবৎ সর্বভূতেষু'— আমাদের পরম্পরার এই মুখ্য সংস্কারগুলির হ্রাস দেশে বর্ধিত অপরাধ, নারীজাতির ওপর অত্যাচার এবং যুব সমাজের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার মূল কারণ। এর ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনের কঠোর ব্যবস্থার যেমন প্রয়োজন, তেমনই সমাজের পরিবেশ রক্ষা করতে সঠিক

আচরণের উদাহরণ প্রস্তুত করার প্রবণতার প্রয়োজন।

এরকম পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য সরকারের একটি বড় ভূমিকা আছে একথা আমরা সবাই জানি। সকলের জন্য সংস্কার প্রদানকারী পাঠক্রম, জীবনযুদ্ধে স্বাভিমানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা ও সাহস প্রদানকারী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য শিক্ষা বিভাগকেই বিশেষভাবে দেখতে হবে। ভিস্যুয়াল ও প্রিন্ট মিডিয়ার দ্বারা সংস্কার নষ্ট হওয়ার মতো কার্যক্রম ও বিজ্ঞাপন যাতে না পরিবেশিত হয়, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার কাজও সরকারের সূচনা ও প্রসারণ বিভাগের দায়িত্ব। কিন্তু সরকারের ওপর নির্ভরশীল না থেকে নিজেদের কিছু করতে হবে। আমাদের পরিবারগুলিও সমাজের এক একটি ছোট রূপ। সমাজের পরিপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে আজও পরিবার আমাদের মৌলিক একক রূপেই চলে আসছে। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রম আমরা পরিবারে চালু করতে পারি না, কিন্তু মূল্যবোধের সংস্কার দেওয়া, কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান শেখানো, সাহসের সঙ্গে জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি ও ধৈর্য শিক্ষার পরিবেশ আমরা নিজেদের বাড়িতেই নির্মাণ করতে পারি। এই দৃষ্টিতে আমাদের পরিবারের বড় থেকে ছোট সবার ব্যবহারে উপযুক্ত সংস্কার আনা একমাত্র আমাদেরই হাতে আছে। প্রতিটি পরিবারে আজ এটি হওয়া একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

সরকারের ভূমিকা ছাড়াই আমরা যে বিষয়ে আমাদের কর্তব্য পালন করতে এগিয়ে আসতে পারি তা হলো দারিদ্র্য ও ভেদাভেদ দূরীকরণ। সৌভাগ্যের বিষয়, এই দু'টি বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও কাজ আগে থেকেই চলে আসছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা, স্বাবলম্বনের জন্য স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, হাতে-কলমে কাজ শিক্ষার প্রশিক্ষণ, জলসংরক্ষণ, জৈবিক কৃষি, গো-সংবর্ধন, গ্রামবিকাশ— এরকম অনেক ক্ষেত্রে অনেক লোক কার্যরত আছেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাও এই ক্ষেত্রগুলিতে কার্যরত আছেন। কিন্তু সমাজের বিশালতার অনুপাতে এই কাজের বিস্তার খুবই কম। নিজের রুচি, প্রকৃতি, সময় অনুসারে আমরা যে কোনো একটি ক্ষেত্রে যুক্ত হতে পারি অথবা আলাদাভাবে শুরু করতে পারি।

সমাজ থেকে ভেদভাব দূর করার কাজ খুব বেশি পরিমাণে দ্রুতগতিতে হওয়া প্রয়োজন। মন থেকে ভেদভাবনা দূর করার কাজ সরকার বা প্রশাসন করতেও পারবে না। এই কাজ সমাজের উদ্যোগেই করতে হবে। নিজের ঘর থেকে, নিজের পরিবার থেকে প্রত্যক্ষ কাজ শুরু করেই এই কাজ সম্ভব হবে। এজন্য ব্যক্তিগত ব্যবহারে, নিজের পরিবারের পরিবেশে যে আচরণ, কুপ্রথা, কুরীতি ভেদভাবকে বৃদ্ধি করে তা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। জাতিগত, প্রদেশগত, ভাষাগত অহঙ্কার ও আচরণের লেশমাত্রও ত্যাগ করতে হবে। এরকম মন নিয়ে শুদ্ধ ভাবনা নষ্টকারী বক্তব্য শোনা, বলা ও বিভেদ সৃষ্টিকারী পরিবেশ তৈরি করা থেকে বাঁচতে হবে। আমাদের বিশাল হিন্দু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, ভারতমাতার প্রত্যেক সুসন্তান আমার বন্ধু— এই আত্মীয় ভাবনার কষ্টিপাথরে প্রতিটি ছোট বড় কাজের পর্যালোচনা করতে হবে। নিজের সমমর্মী সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে হিন্দুদের ধর্মস্থান, শ্মশান ও জলাশয় সমস্ত হিন্দুর জন্য উন্মুক্ত হোক, হিন্দুদের নানাবিধ পন্থ-সম্প্রদায়, ভাষা, প্রদেশ, শ্রদ্ধাভাজন মহাপুরুষদের নামে হওয়া অনুষ্ঠান উৎসবে সমস্ত হিন্দুর অংশীদারী থাকুক— এরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই কাজ নিজের থেকে আজই আরম্ভ করতে হবে। নষ্ট হয়ে যাওয়া পারস্পরিক প্রীতিপূর্ণ ভাব উদ্ধারের জন্য অনিবার্য রূপে এই সীমা লঙ্ঘন আজ আমাদের করতে হবে।

আমাদের দর্শনের (Philosophy) কোনো কমতি নেই। শাশ্বত মূল্যবোধের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সময়োচিত হিতকারক ভাবনাও আমাদের অনেক মহাপুরুষ রেখেছেন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শনের ৫০তম বর্ষ চলছে। সৌভাগ্যবশত সৎভাবে নিঃস্বার্থবুদ্ধিতে রাষ্ট্র কল্যাণের জন্য আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের সেই সদুপদেশ চরিতার্থ করার সঙ্কল্পও দেশের নেতৃত্বকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যমান দেখা যাচ্ছে। সমাজে চেতনা, একাত্মতা, ব্যক্তিচরিত্র ও রাষ্ট্রচরিত্র, অনুশাসন ইত্যাদি সদ্‌গুণের ভিত্তিতে ধৈর্যপূর্বক সামূহিক উদ্যম যুক্ত হলে সমস্ত বিপদ ও চ্যালেঞ্জ পার করে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুখী ও সর্বাঙ্গসুন্দর জাতীয় জীবনের পথপ্রদর্শক দেশ রূপে দাঁড় করানো অতি দ্রুত সম্ভব হবে।

বিজয়াদশমী বিজয়ের উৎসব। রাষ্ট্রের সামনে উদয় হওয়া এই নতুন বিজয়ের দিগন্ত আমাদের আহ্বান করছে। প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত জাগ্রত থেকে সম্মিলিতভাবে উপাসনা করেছেন বলেই দৈবীসম্পদযুক্ত দেবতাগণ বিজয়াদশমীর দিনে বিজয়ের মুখ দেখেছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ১৯২৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দৈবীসম্পদযুক্ত, শক্তিসম্পন্ন সংগঠিত সমাজ নির্মাণে রত আছে। সমাজে পরিবেশ নির্মাণের ফলে আচরণের পরিবর্তন হয়, তার ফলেই ব্যবস্থা পরিবর্তন খুব আকাঙ্ক্ষিত রূপে হয়। যত বড় আমাদের এই সমাজ, যত গম্ভীর ও জটিল ভিতরে ও বাইরের সমস্যা, লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান— হিন্দুত্বের গৌরব হৃদয়ে ধারণ করে তার অনুরূপ সদ্‌গুণ নিজের স্বভাবের অঙ্গ করে দেশের জন্য সংগঠিত হয়ে জীবনসর্বস্ব অর্পণ করার মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি নির্মাণের এই কাজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শুরু থেকেই করে আসছে। সবাইকে আত্মস্থ করা, সর্বসমাবেশক, সর্বব্যাপক সত্যই হিন্দুত্ব। এটাই আমাদের সত্ত্ব। এজন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা গ্রামে-শহরে, পাড়ায়, রাস্তায় এবং ঘরে ঘরে পৌঁছতে হবে। আমাদের সনাতন রাষ্ট্রের সেই স্বরূপ দেখার জন্য সারা বিশ্ব প্রতীক্ষায় আছে। কোনো একজন কবি লিখেছেন—

'পৃথিবীর দেশগুলি যখন দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে
নিজেদের মধ্যে লড়েছে একটু শান্তির জন্য
তারা এই ভূমিতেই এসেছে।
এ ভূমি সবাইকে বুকে টেনেছে, সবাইকে
করেছে আপন,
ভারতভূমি মহান, ধন্য হিন্দুস্থান।'

সেই মহান দেশের নবনির্মাণে অংশগ্রহণ করতে সবাইকে আহ্বান জানাই।

।। ভারতমাতা কী জয়।।

(রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের বিজয়াদশমী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ)

শাসকের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই কলকাতায় সভা করতে এসেছিলেন অসমের বদরুদ্দিন আজমল। সারা কলকাতা বদরুদ্দিন আজমলের নামে পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছিল। সভাশেষে খুব গোপনে বদরুদ্দিন আজমল সাক্ষাৎ করেছিলেন মমতা-সহ তৃণমূলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে। রাজারহাটের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জামাতের কয়েকজন নেতাও। এই বৈঠকের কথা যাতে জানাজানি না হয় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তবুও সব খবর গোপন করা যায়নি। সেই বৈঠকে জামাতে ইসলামির সঙ্গে তৃণমূলের কি চুক্তি হয়েছিল তা আজও রহস্যাবৃত থাকলেও আজকের ঘটনাক্রম কিন্তু সেই রহস্যের পর্দা ফাঁস হতে চলেছে। জামাতে ইসলামির উদ্দেশ্য বাংলাদেশে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দখল করে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলা, অসম, ত্রিপুরা নিয়ে ইসলামিস্তান গঠন করা। আর তৃণমূলের উদ্দেশ্য অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গকে কব্জা করা। এই চুক্তির অঙ্গ হিসেবেই ইমরানকে রাজ্যসভার সদস্য করা হয়েছে। নলিয়াখালি, ক্যানিং-এর দাঙ্গায় ইমরান প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। তাঁরই নির্দেশে হাজার হাজার জেহাদি হিন্দুদের ঘর বাড়ি দোকান লুঠ করেছিল।

জামাতের পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য তৃণমূল দল যেমন সচেষ্ট ছিল, তৃণমূলের জন্যও জামাতে সচেষ্ট হয়ে কাজ করছে। তৃণমূল সচেষ্ট ছিল বাংলাদেশে হাসিনাকে সরিয়ে জামাতেকে প্রতিষ্ঠা করা আর জামাতে চেষ্টা করছে মমতা যাতে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে তার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা। তিস্তা জলচুক্তি বাধা দিয়ে মমতা জামাতেকে সুবিধা করে দিয়েছিলেন। জামাতে সারাদেশে মোদী-বিরোধী শক্তি হিসেবে মমতাকে ধর্মনিরপেক্ষ মুখ হিসেবে ভাবী প্রধানমন্ত্রী রূপে তুলে ধরেছিল। একমাত্র মমতা প্রধানমন্ত্রী হলেই জামাতে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে কব্জা করে নিতে পারত। ভারতবর্ষে মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া এবং বাংলাদেশে হাসিনার জয়লাভ জামাতে- তৃণমূলের পরিকল্পনা ব্যর্থ করেছে।

নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমরান-কুনালের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। — ফাইল চিত্র

মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তৃণমূল-জামাতে জোট নতুনভাবে পরিকল্পনা সাজাতে বাধ্য হয়। তৃণমূল এই মুহূর্তে সারদা কেলেঙ্কারিতে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, তৃণমূলের নেতারা আতঙ্কিত। কে কবে জেলে যাবেন তার ঠিক নেই। তাই জামাতেকে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাজ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা তৃণমূলের রয়েছে। একটু ভেবে দেখুন, দেশের সীমান্তে আই এস আই মদতপুষ্ট পাকিস্তান সেনারা হাঙ্গামা করছে এবং দেশের ভিতর একই সঙ্গে তৃণমূলের নির্দেশে জামাতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হাঙ্গামা করছে। আই এস আই ও জামাতের একযোগে সন্ত্রাস, অন্যদিকে দেশের ভিতর তৃণমূলের মোদী বিরোধী প্রচার। রাজনীতি আর সন্ত্রাসের লক্ষ্য কিন্তু এক। লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূলের বাড়াভাতে ছাই দিয়ে তিনি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানমন্ত্রী, দিদির দল ৩৪ আসন পেয়েও ঢোঁড়াসাপ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এন আই এ-এর তদন্ত কাজে বাধা দিয়েছিলেন অনেক কারণে। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন সারদা কাণ্ডে তাঁর সততার বেলুন আগেই চুপসে গেছে। এর পর এন আই এ-এর তদন্তে সঠিক তথ্য উদঘাটন হলে তিনি দেশদ্রোহী হিসাবে পরিচিত হবেন এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু এটাও জেনে রাখা দরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোশ ইতিমধ্যেই ফাঁস হয়ে গেছে। বলতে দ্বিধা নেই, সাম্প্রতিক দেশের নানা সন্ত্রাসে তৃণমূল দলের বিভিন্ন স্তরের নেতারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত রয়েছেন। বর্ধমানে জমি কিনে পাকাপাকি ঘাঁটি গড়ার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। জেলার নবাবহাটে তিন কাঠা জমির বায়নানামাও তৈরি হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদের বহু স্থানে ঘাঁটি গেড়ে কাজ চালাচ্ছে জঙ্গিরা। তাদের রক্ষাকর্তা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বীরভূমের নলহাটি, সাঁইথিয়ায় যে গোরুর হাট বসে সেখানে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ থেকে প্রচুর মানুষ গোরু কেনাবেচার জন্য আসেন। এইসব হাট থেকে গোরু ট্রাক বোঝাই হয়ে পাচার হয়ে যায় বাংলাদেশে। এই গোরুপাচারচক্রের পরিচালনার রাশ রয়েছে

তৃণমূল ও জঙ্গিগোষ্ঠীর যৌথ হাতে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, পুলিশের হাতেও বখরা এসে পৌঁছোয়। তাই সবই চলে নিরাপদে নিশ্চিন্তে। নিরাপদে সীমান্ত পারাপার, জালনোটের ব্যবসা চালানো, হাজারো লোকের ভিড়ে গা ঢাকা দেওয়া, যোগাযোগের সুবিধা, সর্বোপরি শাসক দলের প্রশ্রয়— এক কথায় আজ পশ্চিমবঙ্গ হলো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কাছে যথার্থ মরুদ্যান।

বর্ধমান কাণ্ডটি ঘটিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নিষিদ্ধ সংগঠন সিমি এবং বাংলাদেশের পাকিস্তানি আই এস আই মদত পুষ্ট জামাতে ইসলামি। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্য ইমরান, যিনি এরাজ্যে সিমির প্রতিষ্ঠাতা, তার সঙ্গে বাংলাদেশের জামাতের ঘনিষ্ঠতা খুবই স্পষ্ট। এই যোগসাজশ আড়াল করতেই এন আই এ তদন্তে বাধা দিয়েছিলেন মমতা। রাজ্য পুলিশ সিমিকে আড়াল করতেই বিস্ফোরণের প্রমাণ লোপাট করেছে। কিন্তু সীমান্তবর্তী জামাতের জেহাদি ডেরাগুলো যে বিগত পঞ্চায়েত, বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে মুসলমান ভোট তৃণমূলের পক্ষে একচেটিয়া ভাবে টানতে সাহায্য করেছিল তা আজ ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। তৃণমূলের সহায়তায় রাজ্যে এই মুহূর্তে সীমান্ত জেলাগুলিতে জঙ্গিদের ৬৫টি শিবির রয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সূত্রে খবর, সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সিমি বড় ধরনের জাল বিস্তার করেছে। এই চার জেলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি জঙ্গিরা ভারতে ঢুকছে। তারপর তারা সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে শিবির তৈরি করছে। গ্রামাঞ্চলের গরিব ছেলেদের বিস্ফোরণ তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মোটা টাকার লোভে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের কিশোর তরুণরা ওই শিবিরে নাম লেখাচ্ছে। গোয়েন্দাদের মধ্যে শুধুমাত্র নদীয়া জেলাতেই এই মুহূর্তে ২৭টি জঙ্গি শিবির রয়েছে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা এলাকায় একটি শিবির তৈরি হয়েছে। বেলডাঙ্গায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রভাব নষ্ট করতেই নাকি এই শিবিরের উদ্যোগ। জনৈক করিম এই শিবিরের প্রশিক্ষক। এই শিবিরে কেবল অস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে না, বিভিন্ন জেহাদি গোষ্ঠীর ভাষণও শোনানো হচ্ছে। সীমান্তের কয়েকটি জেলায় তথা মুর্শিদাবাদের কয়েকটি অঞ্চলে যাত্রা থিয়েটার এমনকী টিভি দেখাও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। গত তিন বছর ধরে বাউল উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জেহাদিদের ফতোয়ার কারণে। তাদের মতে বাউলরা নাকি ইসলামের শত্রু। লালন ফকিরকে মুরতাদ শত্রু বলেও তারা আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করলে মুসলমান ভাবাবেগকে আঘাত করার অভিযোগ এনে প্রতিবাদকারীকেই হেনস্থা করা হচ্ছে। সীমান্তবর্তী জেলার অঞ্চলে অঞ্চলে যেভাবে জেহাদিদের প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে সেই নিরিখে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বুকে ইসলামকে ভিত্তি করে একটি পৃথক রাষ্ট্র বানাবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে প্রধান সহায়ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর তৃণমূল দল।

১৯৭৭ সালে এই রাজ্যে সিমি গঠিত হওয়ার পর রাজ্যের দুই ২৪ পরগনা, দুই দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং কলকাতার কয়েকটি পকেটে সিমির প্রভাব তৈরি হয়েছিল। এই রাজ্যে সিমি মূলত যে ছাত্র সংগঠনকে ভিত্তি করে ১৯৭৭ সালে তৈরি হয়েছিল সেই সংগঠনের নেতা ছিলেন ইমরান। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০১ সালে নিষিদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত উত্তর ভারতের একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে এই রাজ্যের সিমি নেতাদের নিয়মিত আনাগোনা ছিল। নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ২০০১ সালের পরবর্তী সময়ে মুর্শিদাবাদ কিংবা কলকাতার পার্কসার্কাস এলাকার একটি এন জি ও থেকে তৃণমূল দলের মধ্যে সিমির বহু নেতার অন্তর্ভুক্তি ঘটে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়। নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির কয়েকজন সদস্য পশ্চিমবঙ্গে আলকায়দার নয়া শাখা 'কায়েদার আল জিহাদ' তৈরি করে। সীমান্তবর্তী এলাকার নজরদারি এড়াতেই গত কয়েকবছরে বর্ধমান, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুরের মতো জেলায় এই সংস্থার কার্যকলাপ বাড়তে থাকে। ইমরান এম পি হওয়ার পরে খুব দ্রুত গতিতে অন্যান্য এলাকায় ক্ষমতা বাড়াতে সক্রিয় হয় জেহাদিরা। সংখ্যালঘু অঞ্চলে তৃণমূল-জামাতে একযোগে কাজ শুরু করে। শুধু ইমরান নয় তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে বিতারণের ছুতোয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর হোতা ইদ্রিশ আলিকেও তৃণমূল এমপি করেছে বসিরহাট থেকে জিতিয়ে এনে। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, যে বাড়িটিতে বর্ধমানে বিস্ফোরণ ঘটেছে সেটি এক তৃণমূল সমর্থকের বাড়ি। বিগত নির্বাচনেও এই বাড়িটিতে তৃণমূলের মূল অফিস ছিল। সব থেকে লজ্জার কথা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে আলকায়দাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে তারা বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত নয়। এন আই এ-এর তদন্ত হওয়ার পরে যদি দেখা যায় এই ঘটনায় জঙ্গিরা যুক্ত তখন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণতি কি হবে?

সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো মাদ্রাসা গড়ে উঠছে। মুর্শিদাবাদে গত এক বছরে নতুন ৪৫টি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এই মাদ্রাসাগুলো চলেছে জামাতের টাকায়। রাজ্যের এই এলাকায় সরকার যেহেতু আধুনিক শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ, তাই এই মাদ্রাসাগুলোকেই ওই অঞ্চলের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আর স্থানে স্থানে গড়ে তোলা হয়েছে উর্দু কলেজ। রাজ্যের উর্দু আকাদেমি এখন জেহাদি পত্রপত্রিকা প্রকাশনার জন্যও অর্থ সাহায্য করছে।

একটি নির্বাচিত রাজ্যসরকার রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে মদত দিচ্ছে এমন ঘটনা অভিনব, পৃথিবীতে বিরল। এইসব ঘটনা যাতে প্রকাশ্যে না আসে তাই এন আই এ তদন্তের বিরোধিতা। কিন্তু রাজ্যকে বাঁচাতে মানুষকে সচেতন হতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলি গায়ে দিয়ে মুসলমান তোষণের পরিণতি যে সুখকর হতে পারে না তা আজ সবার বোধগম্য হচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার আকাশে ইসলামি মৌলবাদের অশনি সঙ্কেত

দেবব্রত ঘোষ

২০১৪ সালের ২রা অক্টোবর বর্ধমানের খাগড়াগড়ে যে বিস্ফোরণ ঘটলো তা কিন্তু কোনোভাবেই এক আকস্মিক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বলা চলে ঘটনাটি রাজ্য জুড়ে ক্রমবর্ধমান পৈশাচিক জঙ্গিগোষ্ঠীর আঁতুড়ঘরে ভূমিষ্ঠ ইসলামি মৌলবাদের আতঙ্কিত উদাহরণ। ধৃত রাজিয়া বিবি এবং আলিয়া বিবি তাদের কৃতকর্মের জন্য গর্বিত এবং তাদের জিহাদের ভাষার সঙ্গে ১০০/১৫০ বছর আগের ইসলামি মৌলবাদীদের উচ্চারিত ভাষার কোনো পার্থক্য নেই। সিরিয়া থেকে মিশর, লেবানন থেকে তুরস্ক, ইরান থেকে সৌদি আরব, পাকিস্তান থেকে ইন্দোনেশিয়া হয়ে মালয়েশিয়া-ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী আর মৌলবাদীদের এক অদ্ভুত নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য ও চারিত্রিক ঐক্য বাংলাভাষী মুসলমান রাজিয়া বিবি এবং আলিয়া বিবির মধ্যেও দৃশ্যমান।

এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ইসলামিক মৌলবাদ জন্ম নিচ্ছে মাদ্রাসায়, মক্তবে, প্রাণরস আহরণ করছে বিদেশি অর্থে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা মসজিদগুলোর ধর্মান্ধ মৌলবীদের কাছ থেকে। সীমান্ত জুড়ে ব্যাপক বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ আমাদের রাজ্যে ইসলামিক জেহাদ আন্দোলকে পুষ্ট করছে। অন্য কোনো বই না পড়ে এবং শুধুমাত্র কোরানের খানিকটা বাংলা অনুবাদ পড়ে, আরবি-উর্দু কালচারে নিবেদিত প্রাণ অর্ধশিক্ষিত গোঁড়া মৌলবীদের কাছ থেকে তার অপভ্রংশ ব্যাখ্যা শুনে অন্য ধর্মাবলম্বীদের খুন করে বেহস্তে (ইসলামি স্বর্গ) যাবার পথ প্রশস্ত করতে বাংলাভাষী মুসলমান মেয়েরাও জঙ্গিবাদের পথ বেছে নিচ্ছে।

একথা বলছি না যে মুসলমান মানেই মৌলবাদী বা জঙ্গি, কিন্তু এটাও আবার বাস্তব সত্য যে পৃথিবী জুড়ে মৌলবাদী জঙ্গিদের অধিকাংশই মুসলমান এবং এই সহস্রাব্দে তারাই ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে ধর্মের নামে নৃশংস পৈশাচিকতার আমদানি করেছে। আমাদের

দেশে ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে সংখ্যালঘু তোষণ করা হয় এবং সংখ্যালঘু বলেই জঘন্য অপরাধ করেও পার পেয়ে যায়। বিবর্তনের ধারায় পকেটমার থেকে হয়ে ওঠে অস্ত্রধারী জঙ্গি। ইতিহাসের নির্মোহ বিশ্লেষণ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অহিংস এবং সহিংস দুটো ধারাতেই প্রধানত অংশ নিয়েছিলেন হিন্দুরাই এবং এটাও বাস্তব সত্য যে আমাদের দেশের মুসলমানরা স্বাধীনতা সংগ্রামে সেভাবে সামিল হননি— প্রমাণ ফাঁসির মঞ্চে প্রাণদানকারী শত শত শহীদদের মধ্যে মাত্র একজনই মুসলমান--- আসফাকউল্লা (কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি)।

১৯৩৭ সালে পবিত্র বন্দেমাতরম সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের দাবি মেনে। সেদিনের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বন্দেমাতরমের আংশিক অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়েছিল যেটা অবশ্যই ঐতিহ্যের অঙ্গচ্ছেদ। সেই অঙ্গচ্ছেদকে মেনে নেওয়া যেত যদি বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদের মূলে কোন বলিষ্ঠ ও উন্নততর জীবনদর্শন থাকত। কিন্তু অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপারটাই এসেছিল সেদিনের আপোষকামী কিছু জাতীয় নেতার আবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ। গোঁড়া মুসলমান পত্রিকা আজাদ এবং মহম্মদী বারবার বন্দেমাতরমের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে গেছে। সেদিন আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ অসহায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন মুসলমান সাম্প্রদায়িক অংশের কাছে। মৌলানা জাফর আলি যখন বললেন খাঁটি মুসলমান আল্লা ছাড়া যেহেতু অন্য কারুর কাছে মাথা নত করবে না সুতরাং দেশমাতৃকার চরণে মাথা নত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তখন কোনো কংগ্রেসী বুদ্ধিজীবী বা নেতা বোঝাবার চেষ্টাও করলেন না যে বন্দেমাতরম গাওয়া মানে আল্লার অপমান করা নয়। বন্দেমাতরম্ গানটি কখনো কোনো ভারতীয় জনগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে আঘাত করার জন্য প্রযুক্ত হয়নি। বিষবৃক্ষ একদিনে ফলেনি।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে ইসলামি মৌলবাদ ভারতবর্ষ জুড়ে যে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দাবিতে তার সূচনা কিন্তু হয়েছিল অনেক আগেই। মুসলমান কবি মহম্মদ ইকবাল ('সারে জাঁহাসে আচ্ছা' গানটির লেখক), যাঁকে আজকের বুদ্ধিজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষতার রোল মডেল বলে আখ্যাত করেন তিনিই কিন্তু ছিলেন অবিভক্ত ভারতবর্ষে বিভেদকামী সাম্প্রদায়িকতার প্রথম প্রবর্তক এবং ১৯৩০ সালে এই মহম্মদ ইকবাল বলেছিলেন, ভারত উপমহাদেশের মধ্যে চাই এক ভিন্ন মুসলমান রাষ্ট্র। ইসলামি মৌলবাদের প্রেরণা লাভ করেছিলেন কবি ইকবাল। দেড়শো বছর আগে ইসলামিক মৌলবাদীরা যে ভাষায় কথা বলতো আজকের ইসলামিক মৌলবাদীরাও ঠিক একই ভাষায় কথা বলে। আমাদের দেশের সমকালীন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতারা ইসলামি

মৌলবাদকে প্রতিহত করার জন্য সেদিন কোনো চেষ্টাই করেননি। নেহরু থেকে শুরু করে লালুপ্রসাদ যাদব-মুলায়ম সিং যাদব-মায়াবতী-তথাকথিত বামপন্থী দলগুলো বিশেষ করে সিপিএম পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়তার সেই পরম্পরা আজও অব্যাহত।

ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা চলাকালীন রাজাবাজার, পার্কসার্কাস, খিদিরপুর, চাদনীচক, গার্ডেনরীচ, মেটিয়াবুরুজ এলাকায় ঘুরলেই দেখা যায় শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান-ই পাকিস্তানের সমর্থক। পাকিস্তানের ফ্ল্যাগও ওড়ে। এটা দেশদ্রোহিতার সামিল। কেন এদের তোল্লাই দেওয়া হয়? কারণ একটাই— ভোট। ফল ইসলামি মৌলবাদের ক্রমশ স্ফীতিকায় হয়ে ওঠা যা তৈরি করছে এক মানবিক, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের মুখে দুটো মাত্র শ্লোগান— বাবরি মসজিদ ধ্বংস আর গুজরাট দাঙ্গা। প্রথম ক্ষেত্রে বলি, মুঘল জমানায় বাবরের সেনাপতি মীর বাকি আদি রামমন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেছিল, সুতরাং মসজিদ ধ্বংস ধোপে টেঁকে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলি, গোধরায় যে অসংখ্য নিরীহ হিন্দু করসেবককে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল সেই ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতারা নীরব কেন? মুসলমানরা গোষ্ঠী হিসেবে ভোট দেয় যাতে তাদের শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। হিন্দুরা ব্যক্তি হিসেবে ভোট দেয়।

সুতরাং মুসলমান তোষণ করলেই অবধারিত প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। ইতিহাসের নির্মম সত্য এটা, ধর্মের নামে এতো হানাহানি, হত্যা, ধর্মান্তরিতকরণ, মন্দির-মঠ ধ্বংস, লুণ্ঠন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই সবচেয়ে বেশি করেছে— ভারতবর্ষ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকেরা অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করেছেন। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৬৯ সালের ১৯ এপ্রিল এক আদেশনামা জারি করেছিলেন (কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, চতুর্থ খণ্ড) যার ফলে অসংখ্য হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। রাজস্থানের অম্বরে ৬৬টি মন্দির, চিতোর ও উদয়পুরে ২৩৯ টি মন্দির, গুজরাটের সোমনাথ মন্দির, মথুরাতে কেশবদের মন্দির এবং আরো অনেক হিন্দু মন্দির আওরঙ্গজেব একাই ধ্বংস করেছিলেন। প্রথমেই আসি গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের কথায়। সোমনাথ মন্দির বারবার মুসলমান শাসকদের কোপে ধ্বংস হয়েছে। ১০২৪ সালে গজনির সুলতান মামুদ, ১২৯৬ সালে আলাউদ্দিন খিলজী, ১৩৯০ সালে মহম্মদ বাঘদা, ১৪৬৯ সালে ১ম মুজঃফর আমেদ, ১৭০১ সালে আওরঙ্গজেব। এবার আসি বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসের প্রসঙ্গে। ১০১৭ সালে গজনীর সুলতান মামুদ, ১১৯৪ সালে কুতুবুদ্দীন আইবক, ১৩০০ সালে আলাউদ্দিন খিলজী, ১৪৯৪ সালে সিকান্দার লোদী, ১৬৬৯ সালে আওরঙ্গজেব। আসা যাক মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ মন্দির ধ্বংসের কথায়। ১০১৭ সালে গজনীর সুলতান মামুদ, ১৪৯৫ সালে সিকান্দার লোদী, ১৬৬৯ সালে আওরঙ্গজেব। ১২৩৫ সালে ইলতুতমিস উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর শিবমন্দির ধ্বংস করেছিলেন।

ইতিহাস বলে অন্যধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের জন্মাবধি অর্জিত (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে)। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ''মুসলমানগণ সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভ্রাতৃভাব করে কিন্তু বাস্তবিক কাজে কতদূর দাঁড়ায়। দাঁড়ায় এই যে মুসলমান নয় তাহাকে এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের ভিতর লওয়া যাইবে না, তাহার গলা যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। (বিবেকানন্দ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১২)।'' ''মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা বেশি হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে! ইহার কোনো প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরো কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না। হিন্দু জাতির লোপের সঙ্গে সঙ্গেই এখনও তাহারা যে সকল মহৎ ভাবের প্রতিনিধিরূপে বর্তমান, সেগুলিও লুপ্ত হইবে (বিবেকানন্দ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬২-২৬৩)।'' ''মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি হিংসার পথ অবলম্বন করেছে (বিবেকানন্দ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৯)।'' ''মুসলমানরা যখন আরব হইতে ভারতবর্ষে আসিল, তাহাদের ছিল আরবী আইন আর আরবের মরুভূমির আইন আমাদের ওপর জোর করিয়া চাপানো হইল। (বিবেকানন্দ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৯)।'' ''শতশত বৎসর ধরিয়া আল্লা হো আকবর রবে ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না যে প্রতিমুহূর্তে বিনাশ আশঙ্কা না করিয়াছে। (বিবেকানন্দ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৯)।'' বিবেকানন্দের মতো যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সেদিন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ইসলামিক মৌলবাদের নগ্ন চেহারা।

মৌলবাদী মুসলমানরা মানতেই চায় না যে কোনো নাগরিক তার নিজের দেশের সীমানার মধ্যে সার্বভৌম, ধর্ম ধর্মের, আইন আইনের তাই কোরানের আক্ষরিক অর্থ আর কাব্যিক অর্থ এক নয়। মিশরের এক মুসলমান ঐতিহাসিক আলি আবদাল রেজ্জাক লিখেছিলেন ইসলাম ধর্মে পলিটিক্যাল প্রিন্সিপাল বলে কিছু নেই, যা আছে তা হলো হজরত মহম্মদের প্রফেটিক ও স্পিরিচুয়াল তত্ত্বকথা। তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল। মিশরের মুসলমান সাহিত্যিক মহম্মদ খালাফাল্লা বলেছিলেন, কোরাণের এক অংশ শাশ্বত, কিন্তু যে অংশে পার্থিব বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোকে divine inspiration বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। তাঁকেও শাস্তি পেতে হয়েছিল।

পশ্চিমবাংলা আজ ইসলামিক মৌলবাদীদের কাছে মুক্তাঞ্চল— নদীয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা অবারিত দ্বার। ওরে তোরা কে আসবি আয়! চলে আয়! আমরা তোদের ভোটার কার্ড করিয়ে দেবো, রেশন কার্ড করিয়ে দেবো, তোরা শুধু আমাদের ভোট দে। যে সব মুসলমান পশ্চিমবাংলা বা ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে মনে করেন, নিজের মাতৃভূমি বলে ভালবাসেন তাঁরা স্বাগত। কিন্তু যে সব মুসলমান ভারতের বদলে পাকিস্তান-ইরাক-ইরান-সৌদি আরবের প্রতি নিবেদিত প্রাণ, বাংলা বা সংস্কৃত ভাষাকে কাফেরের ভাষা বলে অস্বীকার করে আরবি-উর্দু ভাষাকে বরণ করে নেন, তাদের প্রতি করুণা দেখাবার কোনো প্রশ্ন নেই। ক্ষমা প্রদর্শনেরও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কারণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সবার আগে।

প্রেম-জিহাদের বিপদ

শূলপাণি বর্মণ

গত ৩১ আগস্ট ২০১৪ একটি বহু প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকায় একটি উপসম্পাদকীয় রচনা নজরে এল। একই দিনে দেখলাম ইংরেজি একটি দৈনিক প্রকাশ করেছে চারু গুপ্তা নামে এক ঐতিহাসিক-এর সাক্ষাৎকার। দুটি রচনারই বিষয়ই 'প্রেম জিহাদ'। বিচিত্র ব্যাপার— দুটি রচনাতেই শেষাংশ প্রায় এক রকম— মনে হয় যেন এক টেবিলে চা খেতে খেতে আলোচনা করতে করতে লেখা। বাংলা দৈনিকের রচনাটির সিদ্ধান্ত— পিতৃতন্ত্রের কাছে হিন্দু নারীদের অবদমনের অন্যতম লক্ষ্য এই 'প্রেম জিহাদে'-র প্রচারের আড়ালে থেকে যাচ্ছে। দলিত পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীদের প্রেম সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই মনস্তত্ত্ব দেখা যায়। তার প্রকাশ খাপ পঞ্চায়েতে বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারে ধরা পড়ে। ঐতিহাসিক চারু গুপ্তাও বলেছেন, এ হলো হিন্দু সমাজের 'patriarchical' ধ্যান ধারণা ও নারী-বিরোধী মানসিকতার ফল।

একই দিনে দুটি দৈনিকে দুজন সাংবাদিক লিখছেন— সাক্ষাৎকার প্রকাশ করছেন, এর পিছনে কারণটি সহজেই আন্দাজ করা যায়। সারা দেশে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে প্রবল জাগরণ ঘটেছে— যার ফল মিলেছে দিল্লীর শাসনব্যবস্থায়, এ হলো তারই প্রতিক্রিয়া। দেশের সর্বত্র ভুয়ো ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা যাঁরা প্রচার করে আসছেন, এ হলো তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তাঁরা বুঝছেন ভুয়ো ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বারা আর দেশবাসীকে ভুল পথে চালিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাদের লক্ষ্য এখন যেমন করেই হোক হিন্দু ঐক্যকে যথাসম্ভব ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা। 'প্রেম জিহাদ' সম্পর্কে বিচার করার সময় হিন্দু সমাজের জাতপাতের প্রসঙ্গ অন্য কোনো যুক্তিতেই একাকার করা যায় না।

ওই ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ আর এক কাঠি সরেস। তিনি বলেছেন পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে ১৯২০ নাগাদ দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, সে সময়ই প্রথম প্রেম জিহাদের গুজব ছড়ানো হয়। পরে দেখা যায় ওই গুজবের কোনো ভিত্তিই নেই। সেই সঙ্গে তিনি সুকৌশলে জুড়ে দিয়েছেন ১৯২০ নাগাদ মাপলা-বিদ্রোহের ঘটনা। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মুসলমান প্রজাদের বিদ্রোহ, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর নাকি আর্যসমাজী আর হিন্দু মহাসভা প্রেম-জিহাদের অভিযোগ শুরু করেছিল। আড়ালের কথাটি হলো ওখানে ভূমিহীন কৃষকরা 'মাপলা' তথা মুসলমান সমাজের মানুষ আর ভূমিবান— উচ্চ বর্গীয়রা মূলত বর্ণ হিন্দু বা খৃস্ট ধর্মাবলম্বী, তাই কেরল উপকূল অঞ্চলে এই বিশেষ প্রচার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তখন অবশ্য কেরল রাজ্যের উদ্ভব হয়নি। কিছুদিন পর মাপলাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের যোগ ঘটে। তারা এর সঙ্গে তাদের শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বটি যুক্ত করার চেষ্টা করে। যেন মুসলমান মাত্রই ভূমিহীন আর অত্যাচারী মানেই হিন্দু বা খৃস্ট ধর্মাবলম্বী! এইভাবে জাতিকে যারা ভেঙে দেখাতে অভ্যস্ত তারা যখন হিন্দুত্ববাদী শব্দের প্রয়োগ ঘটায় তখন বোঝা যায় তাদের মূর্খামি বা চাতুর্য।

যাই হোক, সম্প্রতি দুটি ঘটনার ফলে প্রেম-জিহাদের ব্যাপারে জানা যাচ্ছে— তা নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা। প্রথম ঘটনা মেরঠ জেলার এক মাদ্রাসা-শিক্ষিকার তিক্ত অভিজ্ঞতা। ওই শিক্ষিকা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাকে জোর করে ইসলাম করা হয়। বিয়ে দেওয়া হয় এক মুসলমান ধর্মনেতার সঙ্গে। দ্বিতীয় ঘটনা আরও ভয়ঙ্কর। এটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে। বিশিষ্ট রাইফেল-সুটার, জাতীয় ক্ষেত্রে পদক বিজয়িনী তারা সহদেবের সঙ্গে বিয়ে হয় জনৈক রণজিৎ কোহলির। বিয়ে হয় হিন্দু মতে। তারা সহদেব রণজিৎ কোহলির ঘরে গিয়ে তাজ্জব হয়ে যান। তাকে বিস্মিত করে আবির্ভূত হন রাকিবুল হাসান খান! রণজিৎ

প্রেম-জিহাদের বলি তারা সহদেব।

ফঃ ৩

কোহলি ছিল ছদ্মনাম— আসল নাম রাকিবুল এবং সেই ভদ্রলোক (?) হিন্দু নন। তারা সহদেবের উপর রাকিবুল আর তার পরিবারের লোকজন অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তার একটি মুসলমানী নাম দিয়ে, কলেমা পরিয়ে, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়ে ধর্মনাশ করে এই ধর্মান্ধ পরিবার।

তারা সহদেব সময় বুঝে সুযোগ পেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর কথা শুনে রাঁচী শহরের হিন্দু সমাজে ক্রোধ জাগা স্বাভাবিক। মেরঠের ওই শিক্ষয়িত্রীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। তিনিও ধর্মান্ধ পরিবারের ঘেরাটোপ এড়িয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। 'প্রেম জিহাদ' সুতরাং কোনো ভাবেই কাল্পনিক গুজব নয়। মুসলমান ধর্মান্ধরা বুঝতে পারছেন না, হিন্দু সমাজ এখন আগেকার মতো অবস্থায় নেই। হিন্দু সমাজ তার অন্তর্গত সমস্ত জনসত্তাকে এক শিলা সংগঠনে আনতে চাইছে আজ। 'ন হিন্দুর্পতিতো ভবেৎ'— কোনো হিন্দুই পতিত নয়— এই উদাত্ত আহ্বান ছড়িয়ে পড়েছে আসমুদ্র হিমাচল। ফলে উত্তরপ্রদেশে ভুয়ো ধর্মনিরপেক্ষদের মুখোশ খসে পড়েছে। মায়াবতীর মায়া এখন কাজ করছে না আর। মুলায়ম সিং যাদবের বিজয় রথও আর মোলায়েম নেই। সারা দেশেই একই ব্যাপার চলছে। অনগ্রসর সমাজের 'ঘাঞ্চি মোডি' জনগোষ্ঠীর মানুষ হয়ে উঠেছেন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান— নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী বলে মেনে নিতে হিন্দু সমাজের কোনো আপত্তি নেই, সংশয় নেই।

এই পরিস্থিতি আর তেমন নয় যখন হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার করা মাত্র তাকে সমাজের বাইরে চিরকালের জন্য বের করে দেওয়া হবে। এ হলো এমন সময় যখন অত্যাচারের বিপক্ষে আমরা প্রতিক্রিয়া জানাব। অত্যাচারিত বোনদের সমাজে পুনরাবর্তনের পথ প্রস্তুত রাখব। তাই প্রেম জিহাদের কৌশল অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে। আর সেজন্যই ভুয়ো ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা এরকম সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে চালিয়ে যাবেন ব্যর্থ সমালোচনা।

প্রেম জিহাদের সামান্য কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাংলাতেও এর প্রকাশ দেখা যাচ্ছে— চোখ কান খোলা রাখলে বিষয়টি যে কোনো দরদি ও সচেতন মানুষের নজরে আসবে। কেউ কেউ আছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার শাহেনশা সেজে থাকেন। কেউ দূরদর্শনে চালান অনুষ্ঠান— হিন্দু দেবদেবীদের সম্পর্কে তাদের মশকরা লাগাম ছাড়া--- বাংলাদেশের কোনো মুসলমান সম্ভাষণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি গদ গদ ভাব নজর এড়ায় না। কেউ আবার দুর্গাপুজো পরিচালনা পর্যন্ত করেন। এদের ঘরণীদের দিকে নজর ফেলুন, বুঝবেন প্রেম-জিহাদের মর্ম। কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীলের স্ত্রী হিন্দু— তিনি ঘরে রেখেছেন ঠাকুরের আসন; পুরুষ ভদ্রলোক তাকে রাকিবুলের মতো অত্যাচার করেন না। কিন্তু পরের প্রজন্মের ধর্মপরিচয় কী হবে তাদের? এ নিয়ে প্রশ্ন করে লাভ নেই। বাংলার সর্বত্র এইরকম ধর্মান্তরণের ইতিহাস চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। যদু-র জালালুদ্দিন হয়ে ওঠা, কালাপাহাড়ি কাণ্ডের কথা ভুলে যাঁরা যেতে চান ভুলুন— সবাই ভুলবেন না।

বাংলার সর্বত্র দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুদের অপরাধী কার্যকলাপ, দেগঙ্গা- ক্যানিং-এর দাঙ্গা, তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে হঠাৎ গড়ে ওঠা হাঙ্গামা— সর্বত্র যে সব প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে বাংলার মুসলমানরা এখন তিনটি পথ নিয়েছে। প্রথমত, সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা। এর সহজ উপায় সম্ভব মতো পরিবার-পরিকল্পনা না মানা। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে পরিবারের নতুন প্রজন্মের অন্তত একজনকে জঙ্গি নাশকতায় যুক্ত করার জন্য দান করা। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক পরিমাণে অনুপ্রবেশ ঘটানো। এই ক্ষেত্রে বক্তব্য সুস্পষ্ট। যেসব হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্ট ধর্মের মানুষ অত্যাচারিত হয়ে এদেশে আসছেন তারা শরণার্থী। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা মান্য করা অসম্ভব। তারা আসছে দেশ দখল করতে। তৃতীয়ত, ব্যাপকভাবে লুঠপাট, অপরাধ, মোটর গাড়ি আর গো সম্পদ চুরি করে নিয়ে যাওয়া। দেশের নানা প্রান্তের সন্ত্রাসবাদী অপরাধীদের আশ্রয় দেওয়ার কাজটি করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এই সঙ্গে তারা জালনোটের ব্যবসায় রত লোকজনকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এসবই হচ্ছে ছদ্মবেশী যুদ্ধের লক্ষ্যে।

বাংলার আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক উচ্চ শিক্ষিত নারীদের জন্য অন্য একটি পরিকল্পনা তাদের। প্রেম-জিহাদ। প্রেম-জিহাদের সাধারণ দু'একটি লক্ষণ বলে নিচ্ছি। এই কাজে যুক্ত যারা তারা নিজেদের মুসলমানী নামটি বদলে নেয়— তাদের নামটি হয় একেবারে হিন্দুদের মতো। কেউ জানে না তাদের আসল পরিচয়। দ্বিতীয়ত, এরা অধিকাংশই বেশ খরুচে। বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডায় এদের খরচ করার বহর ছোট ছোট ভাই বোনদের বিস্মিত করে। তৃতীয়ত, এরা আধুনিক সাইবার জগতের সঙ্গে, নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে অত্যন্ত পারঙ্গম। অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ঝকঝকে ব্যবহার তাদের— স্মার্ট বলতে যা বোঝায় তাই। এর পর কি হয় তারা সহদেবের ভাষ্য নজর করলে স্পষ্ট বোঝা যায়।

বাংলা সংবাদপত্রের লেখক ভদ্রলোক বলেছেন এটা তো খুবই স্বাভাবিক। এখন ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে— সাইবার কাফেতে যায়, প্রেম হওয়া স্বাভাবিক। মানছি। কিন্তু বিপরীত ব্যাপারটি তো বেশি দেখা যাচ্ছে না। হিন্দু পুরুষ মুসলমান মেয়েদের পছন্দ করছে না— নাকি অন্য কোনো রহস্য আছে এর আড়ালে? আর হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠিত কোনো মানুষও কোনো মুসলমান মহিলা (তিনিও প্রতিষ্ঠিত)-র সঙ্গে বিয়ে হবার পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন, এমন ঘটনাও আমাদের জানা। প্রেম-জিহাদকে তাই অবাস্তব কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। সাবধান হতেই হবে নচেৎ সমূহ বিপদ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

কালীপ্রসঙ্গ

স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ

প্রচলিত কালীমূর্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দুটি ভাবনা আমাদের জিজ্ঞাস্য মনে প্রশ্ন আসে। স্বভাবতভাবে কালীর পদতলে শায়িত শিব। কালীর একটি পা শিবের বুকে ন্যস্ত। এবং কালীর চারিহস্ত প্রসারিত, জিহ্বা ও অগ্নিজিহ্বা। কালীর এই অগ্নি সাতটি জিহ্বার পরিচয় মুন্ডক উপনিষদে একটি মন্ত্রে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং ঋক্‌বেদের থেকে আরম্ভ করে এর উল্লেখ পাই। যা হল অগ্নির সাতটি জিহ্বা—

''কালী করালী মনোজবা চ শূলহিতা বা চ সুধূম্রবর্ণা।

স্ফূলিঙ্গীনি বিশ্বরুচি চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ।।''

সমগ্র বাংলাদেশে কালীপূজার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সংকলিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে কালীপূজার বিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে। সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মনে করে ষোড়শ শতকের সাধক ধরা হয়, কিন্তু এবিষয়ে পণ্ডিতগণের কাল সম্বন্ধে দ্বিমত আছে। আগমবাগীশের সমসাময়িককালে নদীয়ার শান্তিপুরেও দক্ষিণাকালীর পূজা হয়ে আসছে। পাঁচশ বছর আগে শান্তিপুর মোতিগঞ্জ মোড়ের কাছে গঙ্গা প্রবাহিত হত। আগমবাগীশের শিষ্য কাছিমা ভট্টাচার্য দ্বীপান্বিতা গড়ে মূর্তিপূজার পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে গঙ্গায় বিসর্জন দিতেন। বৃটিশদের নথিপত্রে ঐ পূজা উল্লেখ আছে, বর্তমান মোতিগঞ্জ মোড়ের কাছে দেবী মন্দিরেই পূজিত হয়। কাছিমা ভট্টাচার্যের পুত্ররা ঐ পূজার আয়োজক। সমগ্র বঙ্গদেশে সাধারণত ভাবে স্থানবিশেষে মাঘমাসের কৃষ্ণাচতুর্থী তিথিতে রটন্তী কালীপূজার কথা 'স্মৃতিসমুচ্চয়' গ্রন্থে পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা করার বিধান আছে। এই পূজা ফলহারিণী কালীপূজা নামে পরিচিত। মায়াতন্ত্রের সতেরো পর্বে এর উল্লেখ আছে। ফলহারিণী কালীপূজা যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ সহধর্মিণী জগন্মাতা সারদাদেবীকে আপন শয়নকক্ষে পূজা করেন তা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি। এছাড়া রক্ষাকালী পূজার কথা আমরা জানি। যে কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এর প্রচলন। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, রক্ষাকালীর পূজা বছরের যে কোনো সময়ে শনি ও মঙ্গলবার চতুর্দশী, অমাবস্যা, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে করার বিধান রয়েছে।

এগারোশ দশ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ঠনঠনিয়ার শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দিরের প্রস্তরফলকে লেখা আছে—

''শংকরের হৃদয় মাঝে বালি বিরাজে''।

গ্রহাণের উপাস্য দেবতার তালিকায় পাওয়া যায় গ্রহরাজ শনির উপাস্য দেবতা দক্ষিণা কালিকা অর্থাৎ শ্রীকালী, কালী হলেন দশ মহাবিদ্যার প্রথমা। কালী, মাতঙ্গী, বগলা, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, তারা, শাকম্ভরী— দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিত।

অমাবস্যার রাত্রি বারোটার পরে আদ্যা মহাশক্তির সময় বলে মানা হয়ে থাকে। অমাবস্যার মধ্যরাত্রে পরবর্তী সময়ে সমস্ত সৃষ্টি নিদ্রামগ্ন থাকে। দেবী বললেন, 'হে শুম্ভের পুত্র, তোমার কথা যথার্থ সত্য।' শুম্ভ আজ জগতের কর্তা, ত্রিভুবনের অধীশ্বর। নিশুম্ভও তাঁরই মতো শক্তিশালী। কিন্তু কি জান, ছোটবেলায় খেলার ছলে আমি এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী যিনি আমাকে বিবাহ করতে চাইবেন, তাঁকে প্রথমেই আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে হবে। তিনি যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করলেই আমি তাঁকে পতিত্বে বরণ করব।

তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞার কথা দয়া করে শুম্ভ নিশুম্ভকে গিয়ে জানাও। দেবীর কথা শুনে দূত সুগ্রীব হতবাক। বলে কি এই নারী! যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হয়েছেন, তিনি কিনা নারী হয়ে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান! তাঁর বিস্মিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেবী বলে উঠলেন, 'এখন আর কী করতে পারি? প্রতিজ্ঞা যখন করেইছি, তখন তা পালন করতেই হবে।'

দূত সুগ্রীব শুম্ভের কাছে গিয়ে দেবীর অবাস্তব প্রতিজ্ঞার কথা জানালে, শুম্ভ ক্রোধে অধীর হয়ে যুদ্ধ করতে এলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে যেই শুম্ভ দেবীর দিকে ধাবমান হলেন, তখনই কৌশিকী দেবীর ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাওয়া মুখের ভ্রুকুটি কুটিল কপাল থেকে খড়্গধারী পাশহস্তা কালী বেরিয়ে এলেন। এইভাবেই আমরা কালীর রূপ চণ্ডীর মধ্যে দৃষ্টিপাত করে থাকি। কিন্তু একটি কথা আমাদের মনের মধ্যে উঁকি মারে, সেটি হল এই চণ্ডীতে কালীকে ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা রূপে আমরা পেয়ে থাকি। কিভাবে তিনি পরবর্তীকালে নরহস্ত পরিহিতা দেখি। এই প্রসঙ্গে আমরা দেখি, কালীসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে কালীর রূপকার হিসেবে পণ্ডিতেরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। প্রচলিত সচরাচর শিবের বুকে দন্ডায়মানা রূপটি মহাসাধকের দান হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। এই মহান কালীসাধক হুগলী

জেলার আরামবাগ অন্তর্গত খানাকুলের অধিবাসী। রত্নাকর নামে এক নদীর দুই পার্শ্বে দুটি গ্রাম--- একটি রাধানগর, অপরটি কৃষ্ণনগর। সাধক আগমবাগীশের পূজিত কালীমূর্তি রয়েছে রাধানগরের একটি ত্রিকোণ কালীমন্দিরে। কিন্তু রাধানগরের ত্রিকোণ কালীমন্দিরের কালীমূর্তিটি প্রচলিত কালীমূর্তির মতো নয়। সেখানে দেবী এক পা অপর পার উপর তুলে বসে রয়েছেন। এই কারণেই হয়ত ভক্তরা আগমবাগীশের মায়ের এই রূপের বর্ণনায় তিনি মাকে, 'কখনও কি রঙ্গে থাক মা শ্যামাসুধা তরঙ্গিনী' ভাবনায় ভাবিত করে। যেখানে ভক্তের হৃদয়ে মনে কেনো প্রশ্নচিহ্ন আনয়ন করে না। লীলাময় ঈশ্বরের বা আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী মাতার একেকটি রূপ সাধকের প্রাণে, ধ্যানমূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তাই তাদেরই কল্পনায় আজকের এই বর্তমান অচিন্তনীয়া ও চিন্তনীয়া রূপকে আমরা আমাদের নয়ন দিয়ে উপভোগ করে থাকি। তিনিই আমাদের একাধারে দেবী, অন্যরূপে পরম আশ্রয়দায়িনী মা কালী। তিনিই সেই চণ্ডীর মা দুর্গা, তিনিই কৌশিকী, তিনিই কৃষ্ণবর্ণা হয়ে ভক্তের চোখে নরমুণ্ডমালিনী জগজ্জননী মহামায়া কালী।

কার্তিক মাসে দীপান্বিতা কালীপূজা প্রথম কে প্রবর্তন করেন সে কথা সঠিক জানা না গেলেও নবদ্বীপ অধিবাসী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮২) ও তাঁর বংশধরেরা দীপান্বিতা কালীপূজা প্রচলনের বিশেষ সচেষ্টা করেন। সম্ভবত ১৮০০ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণনগর ও বঙ্গের অন্যান্য এলাকার যেখানে কৃষ্ণনগরের রাজার আধিপত্য ছিল, সেখানে প্রতি বছর কার্তিক মাসে হাজার হাজার কালীপূজা হতো। বর্তমানে দীপাবলী ও দীপান্বিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য এখানেই। এভাবেই কার্তিক মাসের অমাবস্যার দেওয়ালীর দিন যে পূজা হয় তা সর্বাপেক্ষা বেশি প্রসিদ্ধ। এটাই দীপান্বিতা কালীপূজা নামে সুপ্রচলিত। তখন কেবলমাত্র মা কালী জাগ্রতা হয়। সেজন্য এই রাতকে 'মহানিশা' বলে। এই সময় শিবসহ সমস্ত সৃষ্টি মৃতবৎ হয়ে থাকেন। তখন মা কালী তাঁর ভয়ঙ্করীরূপে শ্মশানের চিতাগ্নির সম্মুখে চতুর্ভুজা হয়ে জগতকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় মহালীলা করে থাকেন। এক হাতে অসি অপর হস্তে নরমুণ্ডমালা এবং বর ও অভয় মুদ্রার ও ত্রিচক্ষু জ্ঞাননেত্রে মায়ের কণ্ঠে ৫০টি নরমুণ্ডমালা। এলোকেশে বিরাজিত হয়ে জগতসংসারকে পরিচালনা করেন।

ভারতের পৌরাণিক সাহিত্যে নানারূপে শক্তিময়ী দেবী আবির্ভূত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে দেবী দুর্গা ও কালী সর্বপ্রথম। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একটি ভাষণে উল্লেখ করেছেন ভারতের সনাতন ধর্মের আঙ্গিকে বিচার বিশ্লেষণ করলে তাঁর যুক্তিটি বড়ই রোমাঞ্চকর, 'যতদিন সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন মা কালী পাঁঠা খাইবে আর ভারতের আদিম সর্বপ্রথম দেবতা শিব, তাঁর বড়ো ষাঁড় নিয়ে ত্রিশূল হস্তে ডমরু বাজাইবে।' প্রসঙ্গটি শক্তি সাধনার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেখানে বর্তমান, তেমনিভাবে সনাতন ধর্মের মূল ভাবনায় শক্তির বিকাশ অনস্বীকার্য। যাই হোক, আমরা এবার মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীকালী মূর্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। ঐ প্রসঙ্গে পূর্বা সেনগুপ্তের লেখা 'দেবদেবীর কথা'য় তিনি কালীরূপ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন এইভাবে— 'মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী দুর্গার মতো দেবী কালিকার কথাও বলা হয়েছে। মহিষাসুরকে বধ করার পরে দেবী দুর্গা দেবতা ও মানবদের আশ্বাস দান করে বলেছিলেন, যখনই প্রয়োজন হবে তখনই তিনি দস্যু বধে অবতীর্ণ হবেন।

এরপর ঋষি কশ্যপের ঔরসে স্ত্রী দনুর গর্ভে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দানব ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম হয়। এই ভ্রাতাদ্বয় যৌবনে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করেন ও তাদের তপস্যাতে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা অমরত্বর বর দান করেন— 'তোমরা দেব ও মানবের অবধ্য হবে, কেবল অযোনিসম্ভবা নারীই তোমাদের বধ করতে পারবে।' ব্রহ্মার এই বরে দুই ভাই অজেয় হয়ে উঠলেন। স্বর্গের দেবতা ও মর্ত্যের মানবেরা কেউ আর এই দস্যুদের জ্বালায় সুস্থির থাকতে পারেন না। এই যন্ত্রণাময় অবস্থায় দেবতারা দেবী দুর্গার আশ্বাসবাণীকে স্মরণ করে তাঁকে অসুরনিধনের আহ্বান জানালেন। শিবপ্রিয়া পার্বতী যখন জাহ্নবী জলে স্নানের উদ্দেশ্যে এলেন, তখন ইন্দ্রাদি দেবতারা তাঁকে স্তব করলে তিনি বলে উঠলেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য আমি যে অপূর্ব সুন্দর পুরুষ সংসর্গরহিত কৌশিকী দেবীর সৃষ্টি করেছি দেবগণ কি তা দেখেননি? এই কৌশিকী দেবী পার্বতীর দেহ থেকে নির্গত হলে দেবী কৃষ্ণকোষ ত্যাগ করে গৌরবর্ণা হলেন। কৃষ্ণবর্ণা দেবী কৌশিকী হিমালয়ে ভ্রমণ করতে থাকলে শুম্ভ নিশুম্ভের অনুগত চর চণ্ডমুণ্ড তাঁকে দেখতে পেলেন। দেখে তাঁরা অবাক। এই জনবিরল জায়গায় এত সুন্দরী নারী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে একথা জানালে শুম্ভ আদেশ দিলেন, 'নারীকে বিবাহে রাজি করিয়ে তাঁর সামনে হাজির করা হোক।'

চণ্ডের আদেশে সুগ্রীব নামে মহাসুর দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'দেবী, জগতের কর্তা শুম্ভ যিনি এখন দেবতাদের জয় করেছেন এবং ধনসম্পদে ত্রিভুবন জয় করেছেন, সেই শুম্ভ আপনাকে পরমকাঙ্খিত নারীরূপে কামনা করেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুজনেই আপনাকে বিবাহ করতে চান। আপনি এঁদের মধ্যে যে কোনো একজনকে স্বামী রূপে নির্বাচন করুন।' সুগ্রীবের কথা শুনে দেবী গম্ভীর হলেন ও মনে মনে হাসলেন। তিনিই কখনও ভক্তের কাছে উগ্রকালী, গুহ্যকালী, চামুণ্ডাকালী, দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী ও সিদ্ধকালী। অন্যভাবে— জয় কালী, মনস্কামনা কালী, রক্ষাকালী রূপে ভক্তের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য মা স্বয়ং গ্রহণ করে ভক্তকে কৃতকৃতার্থ করে চলেছেন।

(লেখক রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর-এর শিক্ষক)

গত ১১ অক্টোবর দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে 'বিরাট পুরুষ নানাজী' গ্রন্থটির লোকার্পণ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঞ্চে বাঁ দিক থেকে রয়েছেন বীরেন্দ্রজিৎ সিংহ, দত্তাত্রেয় হোসবালে ও মদনদাসজী।

শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

গত ১২ অক্টোবর কলকাতায় কলামন্দিরে প্রখ্যাত সমাজসেবী সাধুরাম বনসলের স্মৃতির উদ্দেশে বনবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী বনসল গত ২৭ সেপ্টেম্বর লোকান্তরিত হন। শিক্ষা, চিকিৎসা, গো-সেবা, তীর্থযাত্রী সেবা ও সংস্কারমূলক কাজে তিনি আজীবন সক্রিয় ছিলেন। তাঁর স্মৃতিসভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

निवेश
मध्य प्रदेश
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर

आज है आखरी कदम
लेकिन कारवाँ चलता जाएगा...

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

"मैंने मध्यप्रदेश को एक ऐसा विकसित राज्य बनाने का संकल्प किया है, जो कि शांति, सौहार्द एवं आर्थिक संपन्नता के लिए जाना जाए।"

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट – 2014

समिट के हर सूरत में वृहत्तर और बेहतर होने की संभावना है। दो दिनों के सफल आयोजन के बाद समिट के सकारात्मक बिन्दु पर समाप्त होने की आशा है।

एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है जहाँ प्रदेश की निवेश संभावनाओं और निवेशकों को नई दिशा मिलेगी। प्रदेश की विभिन्न निवेश संभावनाओं को निवेशकों के समक्ष रखने के बाद मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने 'मेक इन इंडिया' को सच बनाने में अग्रणी होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

समिट के प्रमुख बिन्दु

- समिट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया।
- 9 पार्टनर कन्ट्रीज और 1 पार्टनर स्टेट।
- 25 से अधिक साझेदार देश।
- 3000 से अधिक प्रतिनिधि।
- 30 से अधिक सेमिनार।

नॉलेज सेमिनार : 10 अक्टूबर 2014

- ऑटो और एंसिलरी – प्रदेश के उद्योगों में मूल्य संवर्धन।
- मध्यप्रदेश : पर्यटन राज्य के रूप में।
- कपड़ा उद्योग – भविष्य की बुनावट।
- पी.पी.पी. के अन्तर्गत निवेश चुनौती।
- भारी यांत्रिकी और मशीन औज़ार – आगे बढ़ते।
- निवेश में वृद्धि के लिए आई.टी./बी.पी.ओ./ई.एस.डी.एम. क्षेत्रों में नीतिगत पहल।

देशों के सेमिनार : • मलेशिया • दक्षिण अफ्रीका • स्पेन

B2B Meetings • B2G Meetings • Networking Lunch and Dinners • Exhibition

सम्माननीय अतिथिगण

श्री अनंत कुमार
केन्द्रीय मंत्री
रसायन एवं उर्वरक

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
केन्द्रीय मंत्री
खान, इस्पात, श्रम एवं रोजगार

श्री थावरचंद गहलोत
केन्द्रीय मंत्री
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

श्री प्रकाश जावड़ेकर
केन्द्रीय राज्य मंत्री
सूचना एवं प्रसारण (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य

श्रीमती निर्मला सीतारमन
केन्द्रीय राज्य मंत्री
वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) वित्त और कॉर्पोरेट मामले

श्री अनिरुद्ध धूत
सीईओ
वीडियोकॉन

श्री जे.पी. गौर
फाउंडर चेयरमैन
जेपी ग्रुप

श्री सुभाष चंद्रा
चेयरमैन
एस्सेल ग्रुप

जनसामान्य के लिये प्रदर्शनी

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट – 2014 का सीधा वेबप्रसारण प्रात: 9.30 बजे से www.sscmp.in/live पर

Register your Intentions to invest with Government of Madhya Pradesh on **www.invest.mp.gov.in**

TRIFAC

CII EY

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

নাগপুরে বিজয়া দশমী উৎসবে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন।
(নিচে) বিজয়া দশমী উৎসবে শস্ত্রপূজন করছেন মোহন ভাগবত।

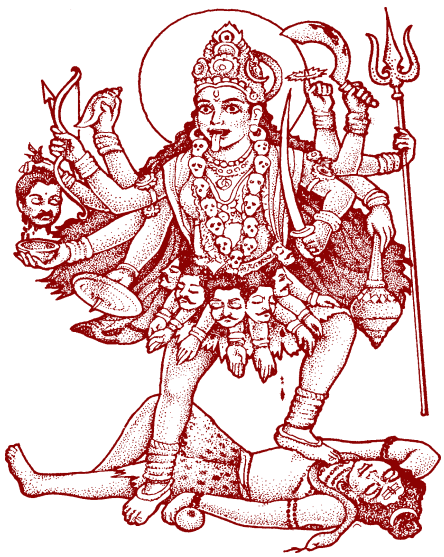

মহাদেবী মহাকালী অচিন্ত্যরূপ চরিত

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

সাধারণত বাংলায় দেবী কালী যেভাবে ও যে রূপে অর্চিত হন তা নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের রচিত 'তন্ত্রসারের' নিয়ম-নীতি অনুসারেই হয়ে থাকে। ন'টি দ্বীপের সমাহার নবদ্বীপ, তার মধ্যে একটি দ্বীপে ন'টি প্রদীপ জ্বালিয়ে আগমবাগীশ মা কালীর সাধনা করতেন। সেই সময় পূজা হোত ঘটে, পটে, শ্রীযন্ত্রে। আগমবাগীশও সেই ভাবেই করতেন। তাঁর ইচ্ছা হলো মাতৃমূর্তি তৈরি করে শ্রীবিগ্রহে মায়ের পূজা করবেন। কিন্তু মায়ের মূর্তি ঠিক কেমন দেখতে হবে তা নিয়ে তিনি ধন্দে পড়লেন। অনেক ভাবেন, কিন্তু সমাধান আর হয় না। দেবী চতুর্ভুজা। কিন্তু কোন হাতে তাঁর অভয়মুদ্রা, কোন পা শিবের বুকে রেখে দণ্ডায়মান তা বুঝে উঠতে পারেন না। শেষে নিরুপায় হয়ে মায়ের চরণে শরণ নিলেন। ব্যাকুল হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মা-কে কাতরচিত্তে বললেন : মা, আমি কী রূপে তোমার পূজা করব তুমি আমায় জানিয়ে দাও। করুণাময়ী কালী মধ্যরাতে স্বপ্নাদেশ দিয়ে মাতৃভক্ত সন্তানের সামনে তাঁর রূপ উদ্‌ঘাটিত করলেন : কৃষ্ণানন্দ, ভোরবেলা তুমি যাঁকে প্রথম দেখবে তার মধ্যেই আমার রূপের সন্ধান পাবে; সেই রূপেই তুমি আমার পূজা দাও।

আনন্দ আর উত্তেজনায় সাধকের আর ঘুম হলো না। ভোর হতেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। গ্রামে ঢোকার মুখে তাঁর চোখে পড়ল এক গোয়ালার বৌ। নববিবাহিত। সুগঠিত শরীর। গায়ের বর্ণ কালো, মুক্ত কেশ, পিঠময় ছড়ানো। এই কাকভোরে তিনি গৃহকাজে ব্যস্ত। কৃষ্ণানন্দকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সিঁথিময় সিঁদুর; লজ্জায় জিভ কাটলেন। একটি হাত তুললেন; হাতে সিঁদুরের দাগ। দুই ভ্রূ ও সিঁদুরের ছোয়ায় রক্তিম। কৃষ্ণানন্দ জোড় হাতে প্রণাম করলেন। এই তাঁর দেবী প্রতিমা।

এই ভাবেই আগমবাগীশের মাধ্যমে অধুনা প্রচলিত কালী বিগ্রহ রূপ পায় বলে প্রচলিত বিশ্বাস। মন্ত্রদ্রষ্টা উপনিষদের ঋষির সত্যদৃষ্টির ধ্যানে মহাকালীর রূপ ধরা পড়ে যজ্ঞাগ্নির শিখা রূপে :

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্র বর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী
লোলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ

মণ্ডুকোপনিষদের যজ্ঞাগ্নির সপ্তজিহ্বার প্রথম জিহ্বার নাম কালী। কালী ধূমাবৃত অগ্নিশিখা।

আবার দশমহাবিদ্যার প্রথম যে রূপ তাও কালী। কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী / ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।। বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতাদশ মহাবিদ্যায় সিদ্ধ বিদ্যার প্রকীর্তিতা।। মহাকাব্য মহাভারতেও কালীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেখানে তিনি ভয়ঙ্করী, মৃত্যুরূপা। মৃত্যুর সঙ্গে মিশে গেছে কালীরূপ। দ্রোণের হত্যার প্রতিশোধ নিতে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার গভীর রাতে প্রবেশ করলেন পাণ্ডব শিবিরে। সবাই যুদ্ধক্লান্ত নিদ্রামগ্ন। অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে একে একে হত্যা করলেন। মৃত্যুর পূর্বে যে দেবীকে দেখলেন— সেও কালী, করাল রূপা, রক্তনয়না, রক্তমালাধারিণী, পাশহস্তা ভয়ঙ্করী। মহাভারতের দ্রোণ পর্বে ৪৫ ও ৪৬ অধ্যায়ে এই মৃত্যুরূপা মহাকালীর বর্ণনা পাই।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী অম্বিকার ললাট থেকে বহির্গত চণ্ডমুণ্ড বধকারী চণ্ডিকাই যে কালী যেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে হিমালয়ে বিচরণকারিণী অপরূপা দেবী অম্বিকার সংবাদ পেয়ে দূত সুগ্রীবকে অসুররাজ শুম্ভ বললেন— যাও, সেই নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে এসো। বলো, আমাদের শক্তিতে ত্রিভুবন কাঁপে, আমাদের মতো শক্তিমান আর কেউ নেই। তিনি আমাদের দুজনের মধ্যে যে কোনো একজনকে বিয়ে করতে পারেন।

দেবী উত্তরে হেসে বললেন— তুমি ঠিকই বলেছ। শুম্ভ শক্তিশালী, তার ভাই নিশুম্ভও শক্তিশালী। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হয়েছে কি জান, বাল্যকালে আমি এক প্রতিজ্ঞা করেছি যে ব্যক্তি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবেন তাঁকেই আমি পতিরূপে গ্রহণ করব।

দূতের মুখে দেবীর এই কথা শুনে শুম্ভ-নিশুম্ভ ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হয়ে দেবীকে জোর করে নিয়ে আসার জন্য ধূম্রলোচন নামে এক দৈত্যকে পাঠালেন। দেবী অম্বিকা ধূম্রলোচনাকে বধ করলে শুম্ভ তাঁর দুই সেনাধ্যক্ষ চণ্ড ও মুণ্ডকে যুদ্ধের জন্য পাঠালেন। তাদের দেখে দেবীর মুখ ক্রোধে কালো হয়ে উঠল। তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল ললাট থেকে খড়্গ ও পাশ হাতে দেবী কালিকা নির্গত হলেন। চণ্ড, মুণ্ডের বধকারিণী

বলে তাঁকে চামুণ্ডা বলা হয়। চণ্ডীতে দেবী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— তিনি কঙ্কালধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, অস্থিচর্ম দেহা, অতি ভীষণা, বিশাল তাঁর মুখমণ্ডল। তাঁর জিহ্বা লোল, ভয় উদ্রেককারী। অম্বিকার ললাট থেকে বহির্গত চণ্ডমুণ্ড ঘাতিনী দেবী চণ্ডিকা-ই কালী রূপে আবির্ভূত হন।

কালী তাই কালস্বরূপা। মহাকাল সকল প্রাণীকে গ্রাস করেন। আবার সেই মহাকালকে তিনি কলন করেন বলে তিনি আদ্যা, পরমা কালিকা। মহানির্বাণতন্ত্রে তাই বলা হয়েছে :

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বখাদ্যা কালিকাপরাঃ।।

মৃত্যুর মতো নির্মম, নিষ্ঠুর আর কী হতে পারে। সেই ভয়াবহ ভীষণ মৃত্যুরও যিনি মৃত্যুরূপা, কালের যিনি গ্রাসকারী তিনি যে কত ভয়ঙ্করী তা কি ভাবা যায়! উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এই মহাশক্তির স্বরূপ :

ভীষ্মাস্মাদ্বাতং পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্বাদগ্নিশ্চেকন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম।।
তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৮

এঁর ভয়ে বাতাস বইছে, সূর্য কিরণ দিচ্ছে, অগ্নি, ইন্দ্র নিজ নিজ কর্মে ধাবিত হচ্ছে।

আবার এই মহাশক্তিকে কঠোপনিষদে 'মহদ্ভয়ং ব্রজমুদ্যতম্' অর্থাৎ উদ্যত বজ্রের মতো ভীষণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল না তখন তিনি বর্তমান ছিলেন। এঁর দ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী। তাই সাধক তাঁর উদ্দেশে বলেন— 'আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী / ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।'

সাধকের সাধন সঙ্গীতে ভয়ঙ্করী মহাকালীর রূপ অপূর্ব রসব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হয়েছে :

রঙ্গে নাচে রণমাঝে কার কামিনী মুক্তকেশী।
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি।।
কে রে তিমির বরনা বামা, হৈয়া নবীন ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা মুখে মৃদু মৃদু হাসি।।
বিনাশে দনুজগণে, দেখে মনে ভয় বাসি
দ্যাখ, শবছলে চরণতলে আশুতোষ পড়িল আসি।।

তিনি করালবদনী, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, তাঁর বাম ভাগের ঊর্ধ্ব হস্তে খড়্গ, নিম্নে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড, আর দক্ষিণ ভাগের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন হস্তে যথাক্রমে বর ও অভয়মুদ্রা। তিনি মহামেঘপ্রভা; দিগ্‌বসনী, কণ্ঠদেশের মুণ্ডমালা হতে নির্গলিত রক্তে তিনি চর্চিতা; শব শিশুদ্বয় তাঁর কর্ণভূষণ। তিনি পীনোন্নত পয়োধরা; তাঁর কটি মেখলা শবের হস্তসমূহ দ্বারা নির্মিত, তিনি সহাস্য। তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় থেকে বিগলিত রক্তধারায় তাঁর বদন বিস্ফুরিত। তিনি ঘোর নাদিনী, শ্মশানালয়বাসিনী, তিনি ভীষণ দন্ত বিশিষ্টা, শবরূপী হৃদয়োপরি তিনি সংস্থিতা। তাঁর চারদিকে শৃগাল-কুকুর বিকট চিৎকার করছে।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর সহজ, সরল, অতুলনীয় ভাষায় কালীতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন : ''ঈশ্বর নানাভাবে লীলা করেন। তিনি মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী ও শ্যামাকালী। মহাকালী ও নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে রয়েছে। যখন সৃষ্টি হয়নি, চন্দ্র, সূর্য গ্রহ ও পৃথিবী ছিল অস্তিত্বহীন, জগৎ ছিল সুনিবিড় আঁধারে মগ্ন, তখন কেবল 'মা'— নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করেছিলেন।'' কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী দর্শনের পর ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে শ্রীনগরে স্বামী বিবেকানন্দ ইংরাজি কবিতা লেখেন— 'কালী দি মাদার'। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মা-কালী একই সঙ্গে ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী বলে প্রতিভাত হয়েছে। এই কবিতা লেখার অভিঘাতে স্বামী বিবেকানন্দ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণের সঙ্গী, তাঁর মানস-কন্যা নিবেদিতা। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'মৃত্যুরূপা মাতা' নামে কবিতাটি অনুবাদ করেন :

ঘোররূপা হাসিছে দামিনী
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা পায়।
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর।
দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়, নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে,
মৃত্যুরূপা মা আমার আয়।
করালি! করাল তোর নাম
মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীমচরণ নিক্ষেপ
প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালী তুই প্রলয়রূপিণী,
আয় মা গো আয় মোর পাশে,
সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তার কাছে আসে।

সন্ন্যাসী-শিরোমণি স্বামী বিবেকানন্দের চেতনায়, অনুধ্যানে মৃত্যুরূপা কালী মাতৃরূপা হয়ে অবতীর্ণ হন। সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও তমোরূপিণী কালীই বর্তমান থাকেন। যেমন সৃষ্টির পূর্বেও তিনি বর্তমান ছিলেন। মহাদেবীর সেই রূপ অবাঙ্‌মনসগোচর। 'কে জানে মন কালী কেমন / ষড়্ দর্শনে না পায় দরশন।' কিন্তু ষড়দর্শনে তাঁকে না পেলেও মন পায়। ভীষণা, লেলিহরসনা এই মহাদেবীকে সাধক পরমাত্মীয়া জননীরূপে জেনেছে। তাঁর কাছে তিনি কালো মেয়ে। তাঁর পায়ের তলায় আলোকনৃত্য। আবার তাঁর অসম্পূর্ণ বেড়া বাঁধার কাজে যেই জননী কন্যারূপে হাতও লাগান, আবার পরমসত্য, মহাজগতের ঘোর রহস্য এক লহমায় তিনি উন্মোচন করে দেন। এই দেবীই তাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দেন, এই মায়ের কাছে এলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়োয়। তার স্বখাত সলিলে অনিবার্য ডুবে যাওয়া থেকে এই 'মা' তাকে রক্ষা করেন। আবার এই মা ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে প্রসব করছেন, অন্যদিকে এই মহাশক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সঙ্গে থেকে অনন্ত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তি প্রদান করছেন। তাই তিনি-ই পরা, তিনিই অপরা, তিনিই শিবমাতা আবার তিনিই শিবানী। 'শিবমাতা-শিবানীং চ ব্রহ্মানীং ব্রহ্মজননীং।

রঙ ভরো

প্রশ্নবাণ

১. বিশ্ব খাদ্য দিবস কবে?
২. বিশ্ব পর্যটন দিবস বছরের কোন মাসে? তারিখ?
৩. শিশুদিবস কবে?
৪. ভারতের কোন্ প্রদেশে সমুদ্র অরণ্য পাহাড় রয়েছে?
৫. ভারতের কোন্ প্রদেশে সমুদ্রতট বেশি?

উত্তর : ১. ১৬ অক্টোবর। ২. সেপ্টেম্বর। ২৭। ৩. ১৪ নভেম্বর। ৪. পশ্চিমবঙ্গ। ৫. গুজরাট।

চিরদিনের লেখা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর লেখা

'উড়ন চণ্ডি পালা'র অংশবিশেষ

ভাই রে ভাই, নির্ঝঞ্ঝাটের বালাই নাই,
খাই দাই নিরাপদে
করি নিজের কাঁসি ডলাই মালাই।
আপন হাত পান্তাভাত, নাই চাটলেম পরের পাত্।
দিনরাত কান মলায়ে কালিয়া খেয়ে সুখটা কই?
হাড়ভাঙা খেটে ক্ষীর সর ছানা—
পিঠের জ্বালা নয় তাতে মানা।
পেটের জ্বালা মিঠে জলে মেটে,
নাও না তাই
বেশি ফৈজতের মোচাক থাক
নুনভাত খাই।।

ওরে ভাই আগে ভাগে যেতে নাই মোড়লি করে,
কার্যসিদ্ধি হলে ভাগে সবারই পড়ে।
দৈবাৎ হয় যদি কাজেতে ব্যাঘাৎ,
আগে যেই রয় সেই হয় কুপোকাৎ।।

নিদ্রার মুখে আগুন, জাগ ভাই
জাগরণের গুণ শ্রবণ করহ কর্ণ কুহরে
নিদ্রাযুক্ত প্রাণী সব বেঁচে থেকে যেন শব
সিঁদ কেটে চোর প্রবেশ করে ঘরে।
হাত দিয়ে লয় গলার হার,
অথবা করে সংহার
বলবানকে দুর্বল করে জয়।
জাগ্রত জীবের ভাই ফৈজৎ বালাই নাই
নিদ্রাতুর জীবাপেক্ষা বাঁচে চতুর্গুণ।।

নারীশিক্ষা ও বিদ্যাসাগর

আঁখি মহাদানী মিশ্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার তেমন কোনো সুব্যবস্থা ছিল না।

পোস্তার রাজপরিবার এবং জোড়াসাঁকো পাথুরিয়াঘাটার রাজপরিবারে এবং আরো কিছু কিছু পরিবারে বিক্ষিপ্তভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। এইসব পরিবারে বাইরে থেকে শিক্ষয়িত্রীরা এসে লেখাপড়া শেখাতেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি।

ভারতবর্ষে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলারা। গোড়ার দিকে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা

চন্দ্রমুখী বসু

বিদ্যাসাগর

বৈদ্যনাথ রায় এবং আরো অনেকে। অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজে প্রথম এগিয়ে এসেছিল 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। ১৮১৯ সালে কলকাতার জুভেনাইল স্কুল।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান কম নয়। বাংলাদেশের মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, সে বিষয়ে ১৮৫৭ সালের শুরুর দিকে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। বাংলার স্ত্রীজাতিকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে তুলে আনার জন্য বিদ্যাসাগর গ্রামে গ্রামে ঘুরতে শুরু করলেন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে। এ বিষয়ে সরকারের সমর্থনের কথা উপলব্ধি করে তিনি পরম উৎসাহ নিয়ে একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় খুলে চললেন।

১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫ মে'র মধ্যে তিনি ৩৬টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এগুলির মধ্যে ২০টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল কেবলমাত্র হুগলী জেলাতেই।

১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর পোটবাতে তিনি প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তারপর একে একে দাসপুর, বৈঁচি, দিগশুই, তালাণ্ডুতেও বিদ্যালয় শুরু করেন।

এই বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক ৮৪৫ টাকা খরচ ছিল। বিদ্যাসাগরমশাই সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ভারত সরকার বিমুখ, বালিকা বিদ্যালয় খোলার জন্য কোনো সাহায্য মঞ্জুর হলো না।

আরো একটি সমস্যা দেখা গেল। বালিকা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকরা শুরু থেকেই কোনো মাইনে পাননি। ১৮৫৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হিসেবে করলে তাঁদের বকেয়া পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। এত টাকা কে দেবে? চিন্তিত হয়ে বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে পাবলিক ইন্সট্রাকশনের কাছে চিঠি লিখলেন। বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য অনুদান মঞ্জুরের আবেদন করে বারবার বিভিন্ন দপ্তরে তিনি চিঠি লেখেন। অবশেষে ১৮৬২ সালের ১ মে থেকে ৭টি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি সাহায্য মঞ্জুর হলো।

অবস্থার ক্রমশ উন্নতি দেখা যায়। বিদ্যাসাগর পত্রযুদ্ধের মাধ্যমে বারবার সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। ইতিমধ্যে তিনি বেথুন স্কুল কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বেথুন স্কুলের প্রগতি সম্পর্কে সরকারকে একটি ভারী সুন্দর রিপোর্ট পাঠান। সরকারি ফিমেল নর্মাল স্কুল খোলার জন্যও তিনি সরকারকে অনুরোধ জানান।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সরকারের মনোভাব অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। স্ত্রী শিক্ষার দিকে সরকারের শুভদৃষ্টি ক্রমে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের কাজটি নির্বিঘ্নে হয়নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম এম.এ পাশ করেন চন্দ্রমুখী বসু। অত্যন্ত খুশি হয়ে বিদ্যাসাগর চন্দ্রমুখীকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হতে শুরু করে। এর পেছনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, মানসিক জেদ এবং কর্মোদ্যমের কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

অনুপ্রবেশের সঙ্কট

অতিথি কলম

রুদ্রনীল ঘোষ   চন্দন নন্দী

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের খাগড়াগড় এলাকায় একটি অবর্ণনীয় 'দুর্ঘটনামূলক' বিস্ফোরণে দুই সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদী উড়ে যাওয়ার পাঁচদিন বাদে সত্য উদ্‌ঘাটিত হতে শুরু করল। সত্যটি হলো— জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশের কার্যকরী শাখার একাংশ ২০০৯ সালে বহু ছিদ্রময় আন্তর্জাতিক সীমানা পার হয়েছিল শেখ হাসিনার বাংলাদেশ সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যকে সফল করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

বর্ধমানের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের চরম দুর্দশা। প্রথমত, তারা জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশের এই কার্যকরী শাখাটিকে চিহ্নিত করতে পারেনি এবং দ্বিতীয়ত, এমনকী ভারত ও বাংলাদেশের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী সন্ত্রাস রুখতে পারস্পরিক সহযোগিতা ক্রমশ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও তারা এদের নিষ্ক্রিয় করতে পারেনি।

বর্ধমানের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের চরম দুর্দশা।

প্রথমত, তারা জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশের এই কার্যকরী শাখাটিকে চিহ্নিত করতে পারেনি এবং দ্বিতীয়ত, এমনকী ভারত ও বাংলাদেশের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী সন্ত্রাস রুখতে পারস্পরিক সহযোগিতা ক্রমশ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও তারা এদের নিষ্ক্রিয় করতে পারেনি। বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল উভয় আমলেই পশ্চিমবঙ্গ সেই প্রবাদের মতো অরক্ষিত বর্মে পরিণত হয়েছে, যেখানে রাজ্যের গোয়েন্দাবাহিনী প্রকৃতপক্ষে কিছুই করছে না, এমনকী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অন্ধ সেজে বসে আছে। যার ফলে হাজার হাজার বাংলাদেশি তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করে অবিশ্রান্ত স্রোতধারার মত সহজেই সীমান্ত পার হয়ে এদেশে চলে আসতে পারছে এই অর্থনৈতিকভাবে অভিবাসী লোকেদের মধ্যে কয়েকজনকে বেছে নেওয়া হচ্ছে যারা তাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে নারকীয় সন্ত্রাসের পরিকল্পনায় অংশ নেবে।

বাংলার গোয়েন্দা বাহিনীর এহেন অনীহা ও অপদার্থতার কারণ কিছুটা তাদের রাজনীতিকরণ আর বাকিটা যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, সে বামফ্রন্টই হোক বা তৃণমূল, পুলিশের প্রতি তাদের অনুচ্চারিত নির্দেশ থাকে যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকে সহজ করে দেখা হয়। যার জন্য রাজ্যকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য চুকিয়ে বিপুল বেআইনি অভিবাসনের কারণে নিরাপত্তা সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্ত এখনো অবধি যতদূর এগিয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে যারা বোমা এবং অস্ত্র নির্মাণের কাঁচামাল তৈরিতে যুক্ত তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের নাগরিক। এরা ভারতীয় পরিচিতি গ্রহণ করেছে এবং সীমান্ত টপকে এদেশে আসার পর এখানকার রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষের নাগরিকত্বের তথ্য-প্রমাণাদি জোগাড় করতেও সমর্থ হয়েছে।

বর্ধমানের মতো জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশের কার্যকরী বাহিনীর অস্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গের ঘনবসতিপূর্ণ সীমান্ত জেলাগুলিতেও থাকা সম্ভব।

বড়মাত্রায় এবং অনিয়ন্ত্রিত অবৈধ অভিবাসন আশ্রয়দাতা দেশের জনবিন্যাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে। এই বিপুল অন্তর্প্রবাহে কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়া যদি নিরাপত্তার স্থায়িত্বকরণ ও জাতীয় স্বার্থের অভিমুখী হয়, যা আমাদের সার্বভৌমত্ব, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই প্রান্তিক রাজ্য। ঐতিহাসিকভাবে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে অসম ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের হাজার হাজার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে মুখ্য প্রবেশদ্বার।

সময়ের অনুপাতে যখন অসমে অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাচ্ছে, বিশেষত যেহেতু উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে সেখানকার বাসিন্দা বনাম

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়মিত হিংসাত্মক সংঘর্ষ হচ্ছে; তখন পশ্চিমবঙ্গে এই অবৈধ প্রবাহ অন্তহীন ভাবে হয়ে চলছে।

'আত্তীকরণে'র যে প্রশ্নটা উঠছে তা বাদ দিলেও এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার কথা ছেড়ে দিলেও— অতীতে বামফ্রন্টের আমলে ও বর্তমানে শাসক তৃণমূলের রাজত্বে অনুপ্রবেশ- বান্ধব প্রশাসন গড়ে তোলা হয়েছে— যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ভোটার-ভিত্তি বৃদ্ধি ও প্রশস্ত করা। কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হলো, বাংলাদেশ কখনো সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেনি যে তাদের এই বড় মাপের অনুপ্রবেশের ঘটনা জানানো হয়েছে বলে। এটা ছাড়াও আরো একটা সত্য যে অসংখ্য নিরাপত্তাজনিত বিষয় সীমান্ত পারের প্রতিবেশীকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া সত্ত্বেও ছিদ্রময় সীমান্ত দিয়ে মানুষের যাতায়াত আমরা সহ্য করে চলেছি। হতে পারে সেটা গবাদি পশু, ফেনসিডিল কিংবা অস্ত্র-শস্ত্রের পাচার— বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডে যেমনটা প্রকাশ্যে এসেছে, যেখানে কয়েকজন অভিযুক্ত খারাপ উদ্দেশ্য নিয়েই বাংলাদেশে বিস্ফোরক চালান করছিল। গোটা সীমান্ত জুড়ে সমৃদ্ধ কালো অর্থনীতি বিরাজ করছে।

কলকাতা ও ঢাকায় কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী আছে যারা এধরনের অনৈতিক নেটওয়ার্ককে মদত জোগাচ্ছে, যৌথ নিরাপত্তা প্রণালীর প্রচেষ্টাকে আরো জটিল করে তুলছে। তা সত্ত্বেও, ভারত ও বাংলাদেশের অবশ্যই উচিত সমঝোতার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতাকে সংহত করা যাতে এখনই এই প্রতিবন্ধকতাকে দূর করা যায়।

নতুন দিল্লীর জন্য, দুর্বল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পালটে ফেলতে হবে--- যা বর্তমানে জঙ্গিগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের জন্য মুক্ত রয়েছে, বর্ধমান কাণ্ডেও এরা এরকমই সমগোত্রীয় উন্মুক্ত অবস্থা পেয়েছিল। আলকায়েদার উপমহাদেশীয় শাখা গঠনের সাম্প্রতিকতম ঘোষণার প্রেক্ষিতে এবং এই অঞ্চলে আই এস আই-এর রিক্রুটমেন্টের জন্য ছিপ ফেলার খবর, একইসঙ্গে উদ্বেগজনক ভয়ের ব্যাপারও বটে। ভারতের সীমা সুরক্ষা বল (বি এস এফ) এবং বাংলাদেশের বিজিবি (বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ)-র মধ্যে কার্যকরী সীমান্ত সহযোগিতাকে অবশ্যই মদত দিতে হবে। ভারতীয় সংসদে অপেক্ষারত একটি সংবিধান সংশোধনী বিলের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের মাধ্যমে জমির সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজটাও জরুরি। সংজ্ঞায়িত ও নিয়ন্ত্রিত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জন্য আশু প্রয়োজনীয় হলো ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহলগুলির বন্দোবস্ত করা— যেগুলি বর্তমানে চোরাকারবারী ও পাচারকারীদের নিরাপদ আস্তানায় পরিণত হয়েছে।

ঢাকার দৃষ্টিকোণ থেকে তার সীমান্তপারের যোগসূত্রের রাশ টেনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে নিজেদের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে। বাংলাদেশের দুরভিসন্ধিপূর্ণ চক্রগুলি সীমান্ত এলাকাকে তাদের নিরাপদ স্বর্গ হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে ২০০৯-এ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লীগ সরকার সেদেশের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। পরবর্তীকালে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে অভিযান এদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে, এমনকী আগের চেয়েও বেশিভাবে, যে সীমান্ত পারের যোগসূত্র তাদের সরকার-বিরোধী কর্মসূচী রূপায়ণের পরিকল্পনা নিচ্ছে। এ বছরের ৫ জানুয়ারি সেদেশের সাধারণ নির্বাচনে দেখা গিয়েছে সমস্ত বড়ো বাংলাদেশি বিরোধী দল নির্বাচন বয়কট করেছে। এনিয়ে সেদেশে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল যেহেতু এই পাপচক্র বাংলাদেশের সরকার-বিরোধী আন্দোলনের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে পারে বলে। এর সঙ্গে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনেরও যোগ রয়েছে যে, আওয়ামি নীতি পাঁচমিশেলি বিরোধী গোষ্ঠীর কড়া হুমকির মুখে পড়ছে। যারা বর্তমান রাজত্বকে সম্পূর্ণ উৎখাত করতে চাইছে। এর সঙ্গে বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়ার ঘোষণাও যোগ করুন যে সরকার-বিরোধী আন্দোলন আবছাভাবে দেখা গিয়েছিল। ঢাকার উচিত ছিল সতর্ক হওয়া। একের পর এক এই সমস্ত ঘটনা নয়া দিল্লীকে সন্ত্রাস রুখতে সীমান্তের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে অবশ্যই সক্রিয় করবে।

অবৈধ অনুপ্রবেশ কাণ্ডে উভয় তরফের কর্তৃপক্ষই সুদীর্ঘকাল ধরে দু'মুখো কৌশল নিয়েছিল। যা বিপদ হিসেবে বর্তমানে নয়াদিল্লী ও ঢাকার মুখে ফুটে উঠেছে।

(সৌজন্য : টি ও আই)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সমস্ত প্রচার প্রতিনিধি বন্ধুদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০১৫ সালটি স্বস্তিকার পাঠক সম্মেলন বর্ষ হিসাবে পালিত হবে। সেই হিসাবে প্রচার প্রতিনিধি বন্ধুরা 'পাঠক সম্মেলন' আয়োজন করবেন। পাঠক সম্মেলনের দিন স্থির করে ১ মাস পূর্বে স্বস্তিকা দপ্তরে জানালে ওই সম্মেলনে স্বস্তিকার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

—স্বস্তিকা, প্রচার প্রসার বিভাগ

প্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর

বহু প্রকল্পে যৌথ উদ্যোগের সিলমোহর

বাস্তবায়িত করতে চাই উভয় রাষ্ট্রের প্রচণ্ড রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবসর প্রাপ্ত)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণ করলেন, দেখলেন, বললেন এবং জয় করলেন। তিনি ওই রাষ্ট্রে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করতে এবং সেইসঙ্গে মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে মার্কিন সফরও সেরে নিলেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঞাঁ নওয়াজ শরিফ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন।

নওয়াজ শরিফ তাঁর ভাষণে ভারতকে দোষারোপ করে বলেন, ভারত পাক-ভারত শান্তির পথে অগ্রসর হতেই চাইছে না, উভয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবদের আলোচনা সামান্য কারণে রদ করে দিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাশ্মীর রেজলিউসন কেন আজও বাস্তবায়িত হলো না? জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের জনমত কেন গ্রহণ করা হলো না?

প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বক্তব্য সর্বত্রই হিন্দি ভাষাতেই রেখেছেন। তিনি বলেছেন, সত্তর বছর আগে যে লক্ষ্য নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল, তখনকার মতো তারা কাজ করেছে, কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ বন্ধ করতে সমর্থ হয়নি। তখন বিশ্বের মুষ্টিমেয় কিছু শক্তিধর রাষ্ট্র তাদের ইচ্ছা এবং প্রয়োজন মতো রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজ চালিয়েছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর চিন্তা নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আজও অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দাবি করে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা হচ্ছে, সমুদ্রের পরিসর নিয়ে অন্যায়ভাবে শত্রুতা করা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ ছেয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আরব রাষ্ট্রগুলি সন্ত্রাসবাদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছে। কেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে আইন করে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না? কারণ কোনো কোনো রাষ্ট্র আজও মনে করে কিছু ভাল এবং কিছু মন্দ সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আছে। সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে কোনো ভাল-মন্দ নেই, সকলেই সন্ত্রাসবাদী এবং নিরীহ নরনারী ও শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। ভারত অনেক দশক যাবৎ এমন সন্ত্রাসবাদের শিকার। পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। আলোচনাও চাই, কিন্তু সেই আলোচনা হবে শান্তিপূর্ণ, সন্ত্রাসমুক্ত

পরিবেশে। তিনি পাকিস্তানের নাম না করে সিমলা চুক্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

বিশ্ব বাণিজ্যিক সমিতির (ডব্লুউ টি ও) পরিকল্পিত নীতিতে সমর্থন না জানিয়ে ভারত ওই নীতিকে রূপায়িত করতে দেয়নি, এই অভিযোগের উত্তরে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ ভারতে বাস করেন, তাদের স্বল্প মূল্যের খাদ্যে ভরতুকি বন্ধ করে ভারত কখনই তাদের অনশনের পথে ঠেলে দিতে পারবে না। বহু বছর ধরে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে পুনর্গঠন করে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি রূপায়িত করা হয়নি, বিশ্ববাসী কি তার জন্য আরও ২০-২৫ বছর প্রতীক্ষা করবে? বিশ্বের পরিবেশ রক্ষা, খাদ্য সমস্যা সমাধান, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পরিষ্কার ইন্ধন ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্বসংস্থাকে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হতেই হবে। এই ভাষণে তিনি কোনো পক্ষকেই দোষারোপ করেননি। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন।

এরপর তাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিক সফর আরম্ভ হয়। নিউইয়র্কে ম্যাডিসন স্কোয়ারে প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে বক্তব্য রাখার সময় এক অভূতপূর্ব জনসমর্থন তিনি লাভ করেন। সকাল থেকেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকরা টিকিট কেটে চার পাঁচ ঘণ্টা মোদীর ভাষণের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। অনেকেই স্থানাভাবে প্রবেশ পত্র পাননি, নিকটবর্তী অন্য একটি স্কোয়ারে ভিডিও মারফত তাঁরা ভাষণ শুনেছেন। মোদী তাঁদের মনে করিয়ে দেন যে সুদূর মার্কিন মুলুকে তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথিতযশা। কিন্তু ভারতের সঙ্গে তাদের নাড়ির (আত্মিক) যোগ। ভারতকে তারা ভালবাসেন। ভারতের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাঁরা ভারতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। তিনি শুধু ভারতের উন্নয়নের জন্য প্রয়াস করছেন না, সমগ্র বিশ্বে এক নতুন অভ্যুদয়ই তাঁর লক্ষ্য; শান্তি এবং উন্নয়ন।

তিনি তাঁদের মনে করিয়ে দেন ঈশ্বরের আশীর্বাদে ভারতের যা আছে, বিশ্বে আর কোথাও তা নেই। গণতন্ত্রের প্রতি ১২৫ কোটি মানুষের অখণ্ড বিশ্বাস। দরিদ্রতম মানুষও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। দ্বিতীয়ত, ভারতের যুবশক্তি। শতকরা ৬৫ জন ভারতবাসীর বয়স ৩৫ বছরের কম। অর্থাৎ ভারত আগামী দিনে বিশ্বে শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, শ্রমজীবী মানুষের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। তৃতীয়ত, সমস্ত বিশ্ব রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এতবড় বাজার, ১২৫ কোটি মানুষের চাহিদা মেটাতে বহু পণ্য রপ্তানি প্রয়োজন হবে। এই বাজারের কিছু অংশ ধরতে পারলে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও তাদের উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারবে, তাদের রাষ্ট্রেও বেকার সমস্যা কমবে।

তিনি ম্যাডিসন স্কোয়ারে সকলকে মনে করিয়ে দেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে সর্বপ্রাচীন গণতন্ত্র, আর ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ। এই দুই গণতন্ত্রের মেলবন্ধন বিশ্বে নতুন সম্ভাবনা এনে দিতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে মার্কিন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে, কিন্তু বিশ্বে এমন কোনো রাষ্ট্র নেই যেখানে ভারতীয়কে পাওয়া যাবে না। তারা সর্বত্র গিয়ে ঘর বেঁধেছে।

তিনি ঘোষণা করেন সরকারের কাজ হলো ভাল করে সরকার পরিচালনা করা, কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষের উচিত হবে সেই কল্যাণকামী সরকারকে সহায়তা করা। উন্নয়ন একটা গণ-আন্দোলনের রূপ নেবে। প্রতিটি মানুষ যেন অনুভব করেন তিনি যা কিছু করেছেন, রাষ্ট্রের উন্নয়নে সেটাই তাঁর যোগদান। ভারতে সব সময়ই মহান ব্যক্তিরা এসেছেন, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে তাঁরা চলে গিয়েছেন, যেমন শিখ সম্প্রদায়ের গুরুরা, সৈনিকরা। মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার জন্য নতুন দিকনির্দেশ করে গিয়েছেন। ভারত উন্নয়নের পথে সফলতা পাবেই, কারণ ভারতে প্রতিভার কোনো অভাব নেই। ভারতের মঙ্গলগ্রহে উপগ্রহ পাঠানোর সফলতা তারই নিদর্শন। প্রথম প্রয়াসেই ভারতই একমাত্র রাষ্ট্র যে সফল হয়েছে। কিন্তু কত খরচে? আমেদাবাদে এক কিলোমিটার যেতে দশ টাকা খরচ হয়, কিন্তু ভারতের মঙ্গল উপগ্রহ প্রতি কিলোমিটার সাত টাকা খরচে পাড়ি দিয়েছে। একটা যুদ্ধ বিমান কিনতে যে টাকা লাগে তার চাইতেও কম বাজেটে এই প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন সমস্ত ভারতীয় বংশজ মার্কিন নাগরিকদের আজীবনের মতো ভিসা দেওয়া হবে প্রথম বারেই।

এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ জন শিল্পপতির সঙ্গে ভারতে বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন, সরকারি দপ্তরের লাল ফিতে নয়, তাঁরা লাল কার্পেটে অভ্যর্থনা পাবেন। ভারতে পরিকাঠামো ও উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রচুর। ভারতে নির্মাণ করে বিশ্বের অন্যত্র রপ্তানিও তাঁদের পক্ষে লাভজনক হবে। তিনি ডাক দিয়েছেন— 'মেক ইন ইন্ডিয়া' (ভারতে প্রস্তুত কর)। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন মার্কিন পর্যটক এবং শিল্প সংস্থার ব্যক্তিদের জন্য ভারতে আসার পর ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

এরপর প্রধানমন্ত্রী কাউন্সিল ফর ফরেন রিলেসনস, অর্থাৎ বৈদেশিক সম্পর্কের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁদের প্রশ্ন ছিল, ভারতে খাদ্য সুরক্ষা নীতি শিথিল না করায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রকল্প রূপায়িত করা যায়নি। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের দ্বন্দ্বে ভারত নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করছে না, যে শান্তিপূর্ণ পরমাণু প্রকল্পে ভারতকে স্থান দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কঠোর পরিশ্রম করেছে, সেটা ফলবতী করতে ভারত পরমাণু দায়িত্ব ধারা অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটলে রপ্তানিকারকদেশ কতটা দায়িত্ব নেবে প্রশ্ন তুলে রপ্তানিতে বাধা সৃষ্টি করেছে ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রী সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছেন, দরিদ্র মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়। পরমাণু দুর্ঘটনা দায়িত্ব সম্বন্ধে ভারত সচেতন হয়েছে জাপানে পরমাণু প্রকল্পে দুর্ঘটনা এবং ভুপালে কার্বাইড কারখানায় দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তিনি আরও জানান, প্রতিরক্ষা প্রকল্পে মার্কিন যোগদান উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই লাভদায়ক হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে

মার্কিন পরমাণু চুল্লি ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত এনে দিতে পারে। পরিদূষণ রক্ষা করতে বিশেষ করে ক্ষতিকারক গ্যাস ছড়ানো বন্ধ করার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ অন্য উন্নত রাষ্ট্রগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলেন, স্পষ্ট বোঝা গেল।

এরপর তিনি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করেন। ভারতে জল প্রকল্প, কৃষি প্রকল্প ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। উভয় রাষ্ট্রের সহযোগিতার ক্ষেত্র যে অপার, উভয় রাষ্ট্রপ্রধানই স্বীকার করেছেন।

সর্বশেষে, বহু প্রতীক্ষিত হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কূটনৈতিক নিয়ম কানুন প্রোটোকল সরিয়ে রেখে নরেন্দ্র মোদীকে অভ্যর্থনা জানান। উপরিউক্ত সমস্ত বিষয়ই এই আলোচনায় উঠে এসেছিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম আলোচনার বিবরণ দিয়ে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, এতদিন ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু রাষ্ট্র ছিল, স্ট্র্যাটেজিক অংশীদার হওয়ার বিষয় অনেক পরে চিন্তা করা হয়েছে।

সরকারি এবং বেসরকারি স্তরে প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যৌথ বিবৃতিও জারি করা হয়েছে। মোটের উপর প্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্কিন সফর বহু বছর পর একটা অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত একটি ঘটনা বলেই বিশ্বে আখ্যাত হয়েছে। এই দৃশ্যতঃ সাধারণ মানুষটির অসাধারণ বাগ্মিতা এবং প্রতিটি বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান ভারতবাসীকে চমৎকৃত করেছে।

আলোচনার পর যে নথিটিতে উভয় রাষ্ট্র প্রধান স্বাক্ষর করেছেন তাতে প্রতিটি বিতর্কিত বিষয়ও স্থান পেয়েছে। যদি সেই প্রতিটি বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাস্তবায়িত করতে হয়, তাহলে উভয় রাষ্ট্র প্রধানকে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি প্রদর্শন করতে হবে। যেমন পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে দূষিত গ্যাস নিয়ন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে মার্কিন কংগ্রেস কখনও সরকার পক্ষকে সমর্থন করেনি। পরমাণু চুল্লির নির্মাণে দুর্ঘটনার দায়িত্ব বিষয়ক ভারতের দাবি তাঁরা কখনই সমর্থন করেননি। ভারতে খাদ্যে ভরতুকি দেওয়ার বিষয়ও তাঁরা সমর্থন করেননি। বিভিন্ন উদ্ভাবনের স্বত্ব ও 'পেটেন্ট রাইট' ভারতে অবহেলিত বলে তাঁদের অভিযোগ।

ভারতে প্রতিরক্ষা বিষয়ে বিদেশি পুঁজি নিয়োগ নিয়ে বহু দলের অমত রয়েছে। আবার ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির নিবেশ (বহিরাগত) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পে বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে অনেকে আন্দোলন করছেন। এইসব বিষয়ে অগ্রসর হলে ভারত বিদেশি শক্তির কাছে বিক্রীত হয়ে যাবে বলে অনেকের ধারণা। পরমাণু চুল্লি নির্মাণেও অনেক অঞ্চলে বিরোধিতা করা হচ্ছে। ভারতকে আরও বহু বছর কয়লা, গ্যাস ও খনিজ তেলের উপর আমদানি করে ওই সবের উপর নির্ভরতা কমানো অথবা পরিশ্রুত করার প্রয়াস অনেক স্বার্থান্বেষী সংস্থা ভাল চোখে দেখেছেন না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অভিযানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি সততার সঙ্গে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে? এটাও অনেকের প্রশ্ন। এমতাবস্থায় এই সমস্ত বিষয়ে শুধুমাত্র সাংসদদের সম্মতিই নয় প্রতিটি রাজ্যের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভ করে রাজনীতি সর্বস্ব ভরতে এক অতুলনীয় প্রয়াস প্রয়োজন। আশা করব উভয় রাষ্ট্রের দূরদর্শী নেতৃত্ব এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। কাজী নজরুলের একটি কবিতা মনে পড়ছে,

''দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা
হুঁশিয়ার...''

প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি সেই কান্ডারি হতে পারবেন? আমি আশাবাদী, সদিচ্ছা এবং দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ যেখানে মূল লক্ষ্য এক্ষেত্রে উন্নয়ন, তাঁরা অবশ্যই সফল হবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত প্রকৃতপক্ষে এবং যোগ্য স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের স্থানে পৌঁছবে।

সেনা ভর্তি প্রশিক্ষণ শিবির

আগামী ২ নভেম্বর রবিবার দুপুর ২টা থেকে ৮ নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত সীমা জনকল্যাণ সমিতি, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে 'সেনা ভর্তি প্রশিক্ষণ শিবির' নদীয়া জেলার জিৎপুরে নতুন বি. এড. কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সের শারীরিক ভাবে উপযুক্ত মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পাশ যুবকরাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

—ঃ যোগাযোগ ঃ—

জ্যোতির্ময় দেব— ৯৬৭৪১৬২০১১
সুভাষ নন্দী— ৯০৫১৪৪৮৬০১
অর্জুন কুমার বিশ্বাস—৭০৬৩৬১৮৭৯৩
ডাঃ দিলীপ মণ্ডল— ৯৬৭৯১০২৯০৯

(যোগাযোগ করেই শিবিরে অংশগ্রহণ করতে পারবেন)

থাকে যদি
'ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা ®
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
DUTA
TURMERIC
POWDER
50g
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
pure
INDIAN
SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

নীরব সমাজ সেবক

রাজদীপ মিশ্র॥ কমল দত্ত। ওড়িশার বনবাসী সমাজের কাছে যেন এক আশার আলো। গরিব দুঃখী বনবাসী সমাজের কাছে যেন এক নতুন দিগন্ত। কমল দত্তর জন্ম অধুনা বাংলাদেশে। কিন্তু আজ তিনি কটক শহরের সমস্ত মানুষদের কাছের মানুষ, কাজের মানুষ--- সবার প্রিয় 'কমলদা'। স্থানীয় চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, শিক্ষক, অধ্যাপক, চাকুরিজীবী, রিক্সাচালক, মুটে, মজুর— সবাই কাছেই খুবই পরিচিত ব্যক্তি এই কমলদা।

প্রতিদিন সকাল হলেই সাইকেলে করে কোনো না কোনো বস্তিতে হাজির হন তিনি। সেখানকার অসুস্থ মানুষদের খোঁজ খবর নেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ঔষধপত্র জোগাড় করে দেওয়া তাঁর নিত্যদিনের কাজ। এরপর তিনি যান এস.সি.বি. মেডিক্যাল কলেজ এবং হসপিটাল, সিটি হসপিটাল এবং অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে। সেখানে দুঃস্থ রোগীদের জন্য রক্ত ও ওষুধের ব্যবস্থা করা তাঁর মহৎ কাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের অধীনে 'রুগ্ন সেবা' প্রকল্পের সেক্রেটারি কমলদা।

পূর্ব পাকিস্তান তখন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে যেসব হিন্দুরা বাস করত তাদের জীবনে নেমে এসেছিল এক ভয়ানক অন্ধকার— খানসেনার অকথ্য অত্যাচার। পাকিস্তানি খানসেনা এবং রাজাকার বাহিনীর গুণ্ডারা যৌথভাবে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কমল দত্ত তখন তাঁর পুরো পরিবার হারান। তাঁর চোখের সামনে অত্যাচারী মুসলমানরা নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে তাঁর বাবা ও মা'কে। সৌভাগ্যবশত তিনি বেঁচে যান। ভারতীয় সেনারা তাঁকে উদ্ধার করে তাঁকে ভারতে আনে এবং দিল্লীতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে। কিছুদিন পর তাঁর

কমল দত্ত

সঙ্গে যোগাযোগ হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের। তিনি সঙ্ঘের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিদিন সঙ্ঘের শাখায় আসতে থাকেন এবং সঙ্ঘকাজের জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করতে মনস্থির করেন। কিছুদিন পর তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে তাঁর জীবন নতুনভাবে শুরু করেন।

১৯৮০ সালে তাঁকে ওড়িশায় পাঠানো হয় সঙ্ঘকাজের জন্য। ওড়িশার গুণপুর এবং ফুলবনির বনবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তিনি সঙ্ঘকাজ শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে আসেন কটকে। সেখানে 'রুগ্ন সেবা প্রকল্প' শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল— যে সমস্ত দুঃস্থ মানুষেরা চিকিৎসার জন্য কটকে আসেন তাঁদের সেবা, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, রক্ত এবং ওষুধের ব্যবস্থা করা। এই মহৎ কাজকে সুচারুরূপে পরিচালিত করার জন্য তিনি একটি কমিটি তৈরি করেন, যার সদস্যরা হলেন— ডাঃ অজিত প্রসাদ বোস, ডাঃ রাধেশ্যাম ভাওসিঙ্কা, ডাঃ দীপক জেঠি, ডাঃ গৌরপ্রসাদ সৎপতি। এনারা সকলেই এক-একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং সমাজসেবি। এছাড়াও আরো অনেক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি কমলদার এই মহান কাজে স্বেচ্ছায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিভিন্ন ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে ওষুধ সংগ্রহ করে বনবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে তিনি প্রতিদিন নিয়ে যান এবং দুঃস্থ রোগীদের তা দিয়ে আসেন। কমলদার সুমিষ্ট ব্যবহার জাতি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের কাছে তাঁকে প্রিয় করে তুলেছে। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য সবশ্রেণীর ও সবপেশার মানুষ তাঁর পরম বন্ধু।

কমলদা ওড়িশাকে ভালোবেসেছেন। ওড়িশার মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। ওড়িশা তাঁর কর্মভূমিতে পরিণত হয়েছে। প্রচার মাধ্যমের আলো থেকে শতযোজন দূরে থেকে তিনি নীরবে জনসেবার মহান ব্রত পালন করে চলেছেন। পুরস্কারের পেছনেও তিনি লালায়িত হয়ে ছোটেননি। এই মহান সেবাপরায়ণ ব্যক্তিকে প্রণাম।

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"নিন্দার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হওয়া কখনও হিন্দুধর্মের রীতি নয়। বরং সঙ্কটকালে উচ্চ আদর্শের পতাকাটি বারবার তুলে ধরেই এই ধর্ম উন্নত হয়েছে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

তপস্যাদীপ্ত চেতনায় উদ্ভাসিত জ্ঞানই বেদ

দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী।
—(রবীন্দ্রনাথ)

ভারতবর্ষ ধর্মভূমি তপোভূমি। মানব সভ্যতার আলোক, জ্ঞানালোক ভারতের ভূখণ্ডেই প্রথম উদ্ভাসিত হয়। ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম যেমন অনাদি এবং অপৌরুষেয়, কোনো ব্যক্তি এই ধর্মের স্থাপন কর্তা নয় তেমনি এই ধর্মের মূল আশ্রয় এবং জীবন ও সমাজের দিক-নির্দেশক যে প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ তাও অপৌরুষেয়। ঋষিগণও এই বেদ রচনা করেননি, তাঁরা ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা— ‘ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্তারঃ।’ তাঁদের তপস্যাদীপ্ত চেতনায় যে অলৌকিক সত্য বা জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল তারই নাম বেদ। বেদ শব্দটি ‘বিদ্’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ হলো জ্ঞান। অনাদি অনন্ত শাশ্বত জ্ঞান।

এই বেদবিষয়ক সম্প্রতি দুটি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—

(১) বেদ বিজ্ঞানের গভীরে— তত্ত্বে, প্রকাশে।

(২) বেদরহস্য।

বেদ বিজ্ঞানের গভীরে

গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা দুটি মনে হয় পাঠকের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। লেখক প্রথম সংস্করণে লিখেছেন— ‘বেদ হলো ব্রহ্মবিদ্যা। এই বিদ্যাকে বিস্মৃতির গহ্বর থেকে উদ্ধার করেছেন একদল ঋষি। ...ঋষি তাঁর সাধন পথে, সাধনা দিয়ে বেদকে উদ্ধার করেছেন অনুভবে, উপলব্ধিতে।’ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা প্রধানত বেদের বিখ্যাত মন্ত্র ‘মধুবাতা ঋতায়তে...’ কে অবলম্বন করে লিখিত। তিনি লিখেছেন, ‘মাধ্বীঃ গাবঃ ভবন্তু নঃ’ এই অন্তিম অংশটিকে অবলম্বন করে— ‘মধুময় হয়ে উঠুক এই সাধন প্রাণ। সকল অস্তিত্ব ভরে যাক এই মধুভাবে। মধুময় এই জীবন মধু বিতরণ করুক সকলের মধ্যে।’ বেদের উদার চিন্তা ভাবনা ও অপৌরুষেয়তা ফুটে উঠেছে দুটি ভূমিকায়। লেখক এই গ্রন্থে বেদের জ্ঞানভাণ্ডারকে মন্থন করে ‘তুমি জাগ্রত হও’, ‘দাও প্রভু, তোমার ওই ব্রহ্মজ্ঞান’, ‘বেদ বিজ্ঞানের গভীরে’, ‘ভক্তি

বিজ্ঞান’, ‘সাধন রহস্য’ প্রভৃতি ৫৬টি অমূল্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

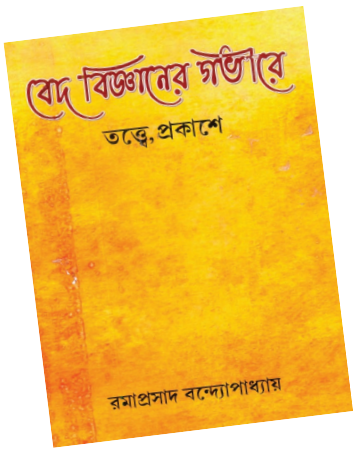

বেদের উদ্‌ঘোষ— ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’, ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং অদ্বিতীয় এবং সর্বানুস্যূত, সর্বব্যাপী। জীবনের উদ্দেশ্যই হলো জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের মিলন। কিন্তু জীবমাত্রই স্বরূপত ব্রহ্ম, কেবলমাত্র উপলব্ধির অপেক্ষা। তিনি প্রস্তুত হয়েই আছেন আমাদের অপেক্ষায়। ‘হরি আছেন নিরন্তর অপেক্ষায়, দিন গুনছেন’— ‘তুমি জাগ্রত হও’ প্রবন্ধে লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সাধকের চাই আস্পৃহা। তাই লেখক লিখেছেন ‘হৃদয়ের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলেই পথের সন্ধান পাওয়া যায়’। সাধকের নিজের যেমন প্রস্তুতি চাই তেমনি চাই প্রার্থনা, নিবেদন। তাই ‘দাও প্রভু, তোমার ওই ব্রহ্মজ্ঞান’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘দাও প্রভু, ঋষির প্রজ্ঞার রূপ ধারণ করে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান সম্পদ।’ ‘সাধন পথে’ লেখাটির মধ্যে সাধনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যেমন বলেছেন— ‘সাধনার পথ সবার জন্যেই নির্দিষ্ট। বুঝে নিতে হবে কোন্ পথটি সাধকের নিজের পক্ষে সেরা।’ আবার ঋগ্বেদের ১/৬২/৯ মন্ত্রটির বঙ্গানুবাদে বলেছেন— ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করে ‘দিয়েছ তুমি অফুরন্ত সাহচর্য/সব কর্মের মধ্যেই দিয়েছ সহযোগ।’ ‘সাধনার প্রথম পর্ব থেকেই আসে সাহচর্য। ভগবানের সাহচর্য মানব জীবনে।’ তাই কথায় বলে আমরা এক পা এগুলে তিনি আসেন তিন পা এগিয়ে।

বেদে শক্তি উপাসনার কথাও আছে। সামবেদীয় কেনোপনিষদে আমরা উমা হৈমবতী দেবীর আবির্ভাবের কথা পাই ‘বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্’। লেখকও ‘দিব্যমাতার চলমান দিব্যরথে’ আলোচনায় ঋগ্বেদের বহু প্রচলিত ‘শ্রীসূক্তম্’ স্তোত্রটির প্রত্যেকটি শ্লোক অবলম্বন করে দেবীমাহাত্ম্যের ও সাধনার কথা তুলে ধরেছেন। এইভাবে ৫৬টি আলোচনার মধ্যে অধ্যাপক ড. রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু অমূল্য সম্পদ পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থটির ভাষার গাম্ভীর্য ও মাধুর্য বৈদিক সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। ৪৯৬ পাতার গ্রন্থ, পাতা ও বাঁধাই খুবই ভালো। সেই তুলনায় মূল্য ২০০ টাকা কমই বলা যায়।

বেদরহস্য

‘বেদরহস্য’ গ্রন্থটি মূলত লেখক অমলেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ‘বেদমন্ত্রমঞ্জরী’, ‘বেদাঙ্গ বর্ণ’, ‘মর্ত্যেষু অমৃত’ এবং ‘ঋগ্বেদ সংহিতা’ এই চারখানি গ্রন্থের একত্রিত সঙ্কলন। চারখানি অমূল্য গ্রন্থ একসঙ্গে প্রকাশিত হওয়ায় আগ্রহী পাঠকগণের পক্ষে বেদাধ্যয়নের অনেক সুবিধা হবে বলে মনে হয়। শ্রীঅরবিন্দের ‘বেদভাষ্য’ গ্রন্থ ও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক তথা গ্রন্থের

অনুবাদক নলিনীকান্ত গুপ্তের সহযোগিতা এই গ্রন্থ রচনার মূল অবলম্বন বলা যায়। গ্রন্থের প্রতিটি অংশে লেখকের বেদবিষয়ে গভীর অনুশীলন ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থের 'বেদমন্ত্রমঞ্জরী' (শ্রীঅরবিন্দের ভাষ্যসহ বেদমন্ত্রকোষ) অংশে লেখক ঋগ্বেদ থেকে ২৯৩টি মন্ত্র, মন্ত্রাংশ বা শব্দ নির্বাচন করে সহজ সরল ব্যাখ্যা করেছেন। বেদের বৈশিষ্ট্য হলো, তার শ্লোক বা গদ্যাংশগুলিকে মন্ত্র বলা হয় এবং প্রতিটি মন্ত্রেরই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকে। এখানে ১১নং-এ লেখক 'অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ' (ঋ. ৪/৫৮/৬) অংশটি উল্লেখ করেছেন। ঋষি বামদেব এই অংশের ব্যাখ্যায় মানুষের ভেতরে তার অন্তর হৃদয়ের অর্থাৎ হৃদিমানসের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন— এ যেন এক হৃদয়সমুদ্র। এই হৃদয় সমুদ্র হতে 'হৃদ্যাৎ সমুদ্রাৎ' (ঋ. ৪/৫৮/৫) উৎসারিত হয় শুদ্ধ, উজ্জ্বল চেতনার ধারা যা উত্তরোত্তর আরও উজ্জ্বল হয়ে পবিত্র হয়ে ওঠে। ১৮০ নং — 'বৃহৎ' (ঋ. ১/৭৫/৫) : বৈদিক 'বৃহৎ' শব্দটির ব্যাখ্যায় লেখক জানিয়েছেন— শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বলেন, ''বৈদিক সাধনার লক্ষ্য 'সত্যং ঋতং বৃহৎ'। মানুষের সাধারণ জীবন হইতেছে দেহ প্রাণ আর মন লইয়া। দেহের ক্ষুদ্র কর্ম, প্রাণের ক্ষুদ্র কর্ম ও ভোগ, মনের ক্ষুদ্র জ্ঞান— ইহার বেশি মানুষ জানে না, ধরিতে পারে না। কিন্তু দেহ প্রাণ মনের উপরে আছে একটা বৃহতের প্রতিষ্ঠান। সেখানে উঠিতে পারিলে মানুষ পায় তাহার সত্যপূর্ণ সত্তা, সত্যপূর্ণ কর্ম— অর্থাৎ দেবতার স্বভাব ও স্বধর্ম দিব্যজন্ম।' লেখক আরো লিখেছেন— বেদে 'ব্রহ্ম' ও 'বৃহৎ' একই 'বৃহ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। ব্রহ্ম মুখ্যত শব্দব্রহ্ম, মন্ত্রচৈতন্য। আর 'বৃহৎ' হলো পরব্রহ্ম। মন্ত্রচৈতন্যই সাধকের সত্তাকে বৃহৎ করে।" এইভাবে লেখক ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশ বা শব্দগুলিকে নিয়ে বৈদিক ঋষিদের ভাবগুলিকে উন্মোচিত করেছেন।

গ্রন্থের 'বেদাঙ্গবর্ণ' অংশটি প্রকাশ করে লেখক বেদমন্ত্রের উচ্চারণ সম্বন্ধে সুন্দর দিক নির্দেশ করেছেন এবং সেখানে ব্যাকরণ বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। বৈদিক মন্ত্রের সস্বর উচ্চারণ হয় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ক্রমে অর্থাৎ উচ্চ, নীচ ও মধ্যস্বর ক্রমে। মাঝের স্বরটি থাকে সমাহার অবস্থায়, মাঝের স্বরটির নাম 'স্বরিৎ'। লেখক জানিয়েছেন— 'পানিনির ভাষায় 'সমাহারঃ স্বরিতঃ'। আর সাবধান করে দিয়ে বলেছেন— 'শব্দের কোথায় কতটা ঝোঁক পড়ছে তার ওপরই শব্দের অর্থ ও সমাস অনেক সময় নির্ভর করে। একটু এদিক ওদিক হলে শব্দের অর্থ ও সমাস পাল্টে যায়।' 'বেদাঙ্গবর্ণ' অংশটির বিস্তারিত আলোচনায় বারোটি অধ্যায় রয়েছে।

গ্রন্থের তৃতীয় অংশ 'মর্ত্যেষু অমৃত' (বেদের মন্ত্র ও সাধনা)। এই অংশে লেখক পরাশর, গৌতম, আঙ্গীরস, দীর্ঘতমা, গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র ও বামদেব— এই সাতজন ঋষির দিব্য চেতনার আলোকে প্রকাশিত ঋগ্বেদের সাতটি অগ্নিসূক্তের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। লেখক জানিয়েছেন, 'এক একজন ঋষির কাছে মন্ত্র প্রতিভাত হয়েছে বিশেষ বিশেষ গুণ শক্তি ও অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নিয়ে। অনন্ত শক্তির অনন্ত প্রকাশ মহিমা।' এছাড়াও আরো কয়েকটি বিশেষ সূক্তের ওপর আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে গ্রন্থে ব্যাখ্যাত 'পুরুষ সূক্ত'টি বিশেষ প্রচলিত। নারায়ণের স্নানের ক্ষেত্রে এই পুরুষসূক্তটি ব্যবহার হয়ে থাকে। পুরুষ শব্দটির দ্বারা সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকেই বোঝানো হয়েছে। এই সূক্তে যেমন পরমব্রহ্মের সর্বব্যাপী একটি বর্ণনা আছে তেমনি আবার তাঁরই এক একটি অঙ্গ থেকে জগতের এক একটি অংশ এবং ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণ সৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে, যথা 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ'— পরমব্রহ্মের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ এবং বাহু থেকে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সৃষ্টি হয়েছে। আবার সেই ভূমাপুরুষের মন থেকে চন্দ্রমা এবং চক্ষু থেকে জাত হয়েছেন সূর্য্য 'চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত' প্রভৃতি।

'বেদরহস্য' গ্রন্থের অন্তিম বা চতুর্থ অংশ হলো 'ঋগ্বেদ সংহিতা' (দশম মণ্ডলের কতিপয় সূক্তবিশেষ)। গ্রন্থের এই অংশ ১০ম মণ্ডলের নির্বাচিত ১৫টি সূক্তকে নিয়ে রচিত। ৯নং সূক্তকে 'আপঃ' সূক্ত বলা হয়েছে। আধিভৌতিক দিক থেকে 'আপঃ' শব্দের অর্থ হলো জল। আবার আধ্যাত্মিক অর্থে বলা হয়েছে শ্রদ্ধা এবং যজ্ঞ। তেমনি গ্রন্থে উল্লেখিত ৭২নং সূক্তে দেবতাদের জন্মরহস্য ব্যক্ত করা হয়েছে। আবার ১২৯নং সূক্তের মূল বিষয় হলো— সৃষ্টির অতল রহস্যের এক আত্মগত অনুসন্ধান অর্থাৎ সৃষ্টি কি, কেন? প্রভৃতির অনুসন্ধান। 'ঋগ্বেদ সংহিতা' অংশে লেখক নির্বাচিত সূক্তগুলির বক্তব্য ও ভাবটিকে নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সহজ সরল আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থটির ভাষা ও বিশ্লেষণ খুবই সুখপাঠ্য। পাতা ও বাঁধাই উচ্চমানের। ৪৯৬ পাতার বই। কিন্তু গ্রন্থটির মূল্য মনে হয় কিছুটা কম হলে সাধারণের পক্ষে সংগ্রহ করা সুবিধা হোত।

'বেদবিজ্ঞানের গভীরে' এবং 'বেদরহস্য' গ্রন্থ দুটি প্রধানত ঋগ্বেদকে অবলম্বন করেই রচিত এবং বেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই বিশেষভাবে বর্ণিত এবং বেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। সনাতন হিন্দুধর্ম বেদাশ্রিত ধর্ম। তাই হিন্দু মাত্রেরই বেদ সম্বন্ধে কিছু ধারণা অবশ্যই থাকা উচিত। সেদিক থেকে বিচার করলে বিদগ্ধ লেখক ড. রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমলেশ ভট্টাচার্য লিখিত দুটি গ্রন্থ আগ্রহী পাঠকদের বেদ সম্বন্ধে একটা সম্যক্ ধারণা দেওয়ার পক্ষে খুবই উপযোগী। গ্রন্থ দুটির বহুল প্রচার কামনা করি।

(ক) বেদ বিজ্ঞানের গভীরে---তত্ত্বে, প্রকাশে। লেখক : ড. রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : সত্যের পথ প্রকাশন (কলকাতা)। মূল্য : ২০০ টাকা।
(খ) বেদ রহস্য। লেখক : অমলেশ ভট্টাচার্য। প্রকাশক : সূত্রধর (কলকাতা), মূল্য : ৮৫০ টাকা।

বারুইপুরে মাতৃসম্মেলন

গত ৩১ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরে সেবা ভারতীর সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে মাতৃসম্মেলন হয়। সেবা ভারতীর নিজস্ব ভবনে শতাধিক মা-বোন উপস্থিত ছিলেন। নদীয়া জেলার পলাশীপাড়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী পূর্ণলোকানন্দ মহারাজ উপস্থিত থেকে শ্রীশ্রী সারদা মায়ের জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরে নারীজাতির আদর্শ ও মহিমা ব্যাখ্যা করেন। পরে শিক্ষার্থীরা নাচ, গান, আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন। উল্লেখ্য, সেবা ভারতীর সকল কার্যকারিণীর সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধানিধি

গত ১৪ সেপ্টেম্বর উত্তর মালদা জেলার ব্যবস্থা প্রমুখ অজিত প্রামাণিকের মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধবাসরে শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন বাড়ির বড়বৌদি শ্রীমতি আরতি প্রামাণিক। জেলা সঙ্ঘচালক মোহিতলাল গোস্বামী শ্রদ্ধানিধি গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধানিধি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের প্রচারক উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য মটুকেশ্বর পাল। উল্লেখ্য পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রামের ১০ জন দুঃস্থ মায়ের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ চন্দন সেনগুপ্ত-সহ অন্যান্য স্থানীয় কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

সামবেদ আলোচনা চক্র

দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীকামকোটি পীঠের উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতার লেক অ্যাভিনিউস্থিত বেদভবনে ৫-৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তিনদিন ব্যাপী সামবেদের মন্ত্রাবৃত্তিসহ এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ৬৯তম পীঠাধীশ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য শ্রীমৎ জয়েন্দ্র সরস্বতী স্বামীজী। তিরুপতি বালাজী মন্দিরের অন্যতম বেদজ্ঞ পুরোহিত গণেশ শ্রৌতির নেতৃত্বে একদল দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সামগান পরিবেশন করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। সামবেদের এক একটি ঋক্ মন্ত্র কতরকম সুরে ও কতরকম রীতিতে গাওয়ার পদ্ধতি আছে তা প্রদর্শিত হয়। শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন ড. সমীরণ চক্রবর্তী, ড. ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ড. অমর চট্টোপাধ্যায়, ড. তারকনাথ অধিকারী, গণেশ শ্রৌতি এবং আর. বালকৃষ্ণণ। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণ দেন ৭০ তম পীঠাধীশ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য শ্রীমৎ শঙ্কর বিজয়েন্দ্র সরস্বতী স্বামীজী। বঙ্গদেশে লুপ্তপ্রায় বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে তিনি সকলকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন— যথাযথা উচ্চারণসহ বেদমন্ত্রপাঠ ও বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান মানবকল্যাণের অশেষ সহায়ক। এর দ্বারা প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করা যায়, মানুষের ত্রিবিধ বিঘ্নের নিরসনও করা যায়।

ইম্‌স্‌চ-এর উদ্যোগে ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ কর্মশালা

দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চারিটি (ইম্‌স্‌চ)-র উদ্যোগে গত ২৬ আগস্ট, গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত আনন্দ জেলার 'খামভাট' এবং 'বড়সাদ' গ্রামে ৩৪ তম বর্ষ সার্বভৌমিক ক্যান্সার সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরামর্শদান, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সহায়তা,

সোনারপুরে 'স্বস্তিকা'র পাঠক সম্মেলন

গত ২১ সেপ্টেম্বর, রবিবার বিকালে সোনারপুর শীতলার 'শান্তিদেবী ভবন'-এ এক মনোজ্ঞ পরিবেশে জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দুটি কালাংশে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে স্বস্তিকা পত্রিকার সহ সম্পাদক সুকেশ মণ্ডল পাঠকদের সঙ্গে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে স্বস্তিকা সম্পাদনার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় পর্বে স্বস্তিকার লেখক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরে ঘরে স্বস্তিকা পাঠের বিপুল প্রচেষ্টার উদ্যোগ নিতে সকলকে আহ্বান জানান। পতঞ্জলি যোগ সমিতির জেলা সভাপতি হরিপদ কর্মকার সুস্থ মানুষ গঠনে যোগ প্রাণায়ামের ভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। হিন্দুকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক অমিত ঘোষ দস্তিদার হিন্দুদের ভয় ত্যাগ করে হাজার বছর ধরে মুসলমানদের বিছিয়ে রাখা জাল ছিঁড়ে অখণ্ডভারতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য শপথ নেবার আহ্বান জানান এবং সেই কাজের প্রস্তুতি নিতে স্বস্তিকা, প্রণব, উদ্বোধন, হিন্দুকণ্ঠ ইত্যাদি পত্রিকা পাঠের আবশ্যকতার উপর জোর দেন। প্রধান অতিথি পূজ্যপাদ স্বামী বিশ্বময়ানন্দ মহারাজ বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে সঙ্ঘ পরিবারের কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপ্তি বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। স্বস্তিকা, প্রণব, শঙ্খনাদ ইত্যাদি পত্রিকা নিয়মিত পড়া ও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা অবশ্যই প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি স্বস্তিকার এক একজন গ্রাহককে আরো ১০ জন গ্রাহক করার জন্য সঙ্কল্প নিতে বলেন।

অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে সঞ্চালন করেন শিক্ষিকা জয়ন্তী মণ্ডল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেনন স্বস্তিকার দীর্ঘদিনের পাঠক মৃত্যুঞ্জয় জোয়ারদার।

ক্যান্সার সনাক্তকরণ এবং 'জাতীয় ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ' কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৩৮৪ জন ক্যান্সার আক্রান্ত মা, শিশু, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা অংশগ্রহণ করে। কর্মশালার অংশগ্রণকারী ক্যান্সার আক্রান্ত মা, শিশু, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের বিনামূল্যে ক্যান্সার চিকিৎসা, পরাদর্শ দান, ঔষধ বিতরণ ও রক্ত পরীক্ষা করা হয়। তৎসহ ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলো যাতে বিভাজিত না হতে পারে তা দ্রুত প্রতিরোধ এবং জন সচেতনতা করা হয়।

এছাড়া মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার সারাংপুর ও নারসিংগড় গ্রামে ৪৫৬ জন, হাওড়া জেলার বনহরিশপুর ও তুলসীবেড়িয়া গ্রামে ৫৯২ জন ক্যান্সার আক্রান্তদের চিকিৎসা করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মিশনের মহাসচিব তথা ভারতীয় গোয়েন্দা এবং তদন্ত সংস্থার মুখ্যসচিব (আই. ডি. আই. ও) দেবাশীষ ঘোষ, মলি বাগ্‌চী, ডাঃ সুপ্রিম বোস, ডাঃ রাজশ্রী সেনগুপ্ত, ডাঃ লিপি হালদার, অরুণ ব্যানার্জি, স্বামী বিমলানন্দ গিরিজী মহারাজ, স্বামী মাধব মহারাজ, স্বামী নারায়ণ চৈতন্য ব্রহ্মচারী প্রমুখ।

শ্রদ্ধানিধি

নদীয়া জেলার পলাশী মীরা রায়পাড়া নিবাসী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ তপন রঞ্জন দে-র মাতৃদেবী বিভারানী দে (৯৪)-র প্রয়াণ উপলক্ষে শ্রাদ্ধবাসরে পরিবারের পক্ষ থেকে তপন রঞ্জন দে জেলা সঙ্ঘচালক ধীরেন দেবনাথের হাতে শ্রদ্ধানিধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলেন নদীয়া বিভাগ প্রচারক উত্তম মাহাতো, জেলাপ্রচারক রবিকিঙ্কর ঘোষ, বিভাগ কার্যবাহ ডাঃ প্রবীর বিশ্বাস, জেলা কার্যবাহ সুকান্ত দত্ত-সহ অনেক কার্যকর্তা। জেলা সঙ্ঘচালক শ্রদ্ধানিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

শিলিগুড়িতে চেতন চৌহান

''আমরা সবাই খেলোয়াড়। সবাই কোনো-না-কোনো খেলা খেলি— ইনডোর অথবা আউটডোর। খেলোয়াড়ের জীবনে ক্লান্তি নেই, সব সাধনা করে পেতে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রীড়ামন্ত্রী থাকাকালীন আমি সাংসদ ছিলাম। আমার অনেক সুপরামর্শ তিনি তখন গ্রহণ করেছেন। এখনও আমি আপনাদের কোনো প্রয়োজন বা চাহিদা থাকলে তা কেন্দ্র সরকারের দপ্তরে, এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মমতাদিকেও বলতে পারি। এখন আমি একটি সর্বভারতীয় ক্রীড়া সংগঠন ক্রীড়াভারতীর সর্বভারতীয় সভাপতি। সেজন্য মূলত ভারতীয় খেলা এবং গ্রামীণ এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি।''

গত ২৩ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের ৩০তম বার্ষিক দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন প্রাক্তন টেস্ট ওপেনার চেতন চৌহান। দুটি দৌড়ের আয়োজন করা হয়— ১৫ কিলোমিটার এবং ৬ কিলোমিটার। উত্তরপ্রদেশে, বিহার, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা ও পশ্চিমবঙ্গের মোট ৫০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। দৌড় শেষ হয় বাঘাযতীন ক্লাব প্রাঙ্গণে। শ্রী চৌহান এবং উত্তর সীমান্ত রেলপথের কাটিহার শাখার ডি আর এম শ্রী শর্মা, উত্তরবঙ্গের ডি আই জি পুরস্কার প্রদান করেন। চেতন চৌহান ২২ সেপ্টেম্বর বিকেলে শিলিগুড়িতে পৌঁছন। রাতে স্থানীয় ২৫ জন বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বৈঠকে ক্রীড়াক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের কর্মকর্তা এবং ক্রীড়াভারতীর পূর্ব ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক মধুময় নাথ এবং প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার মনজিৎ সিং উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক উৎপলবাবু। শেষে ধন্যবাদ জানান ক্লাবের সভাপতি এন কে সোনী। শ্রী চৌহান এর সঙ্গে পুরো সময় ছিলেন ক্লাবের অন্যতম সহ-সভাপতি শিবেশ সরকার। অনুষ্ঠানের পর শ্রী চৌহান সেবক কালীমন্দির দর্শন করেন। তারপর তিনি সেবক রোডে বিদ্যাভারতীর কার্যালয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাগডোগরা বিমানবন্দরের পথে রওনা হন।

সমাজ সেবা ভারতীর বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার 'কল্যাণ ভবনে' সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত সহ মোট ৫০ জনেরও বেশি সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর সম্পাদক ঋষিপাল ডাডওয়াল এবং সহ-সম্পাদক গুরুশরণ প্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। সমাজ সেবা ভারতীর বার্ষিক স্মরণিকা 'সেবা চেতনা' প্রকাশিত হয়। সমাজ সেভা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের ২০১৪-১৫ সালের জন্য কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি : শিবদাস বিশ্বাস। সহ-সভাপতি : সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ড. বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী। সাধারণ সম্পাদক : সন্দীপ পাল। সহ-সম্পাদিকা : মুনমুন ঘোষ। কোষাধ্যক্ষ : পিনাকী পাল। সংগঠন সম্পাদক : ধনঞ্জয় ঘোষ। কার্যালয় সম্পাদক : কমল চট্টোপাধ্যায়। সদস্য : মনোজ চট্টোপাধ্যায়। ডাঃ সনৎ কুমার বসুমল্লিক, রাজকুমার ঝা, সুখেন্দু মণ্ডল।

সমাপ্তি ভাষণ দেন গুরুশরণ প্রসাদ। ওইদিন সভায় ৩ জন আজীবন এবং ৫ জন বার্ষিক সদস্য হিসাবে নাম নথিভুক্ত করান। বিভিন্ন জেলা থেকে ৩টি ট্রাস্ট সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদন পায়।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সংস্কার ভারতীর নটরাজ সম্মানে সম্মানিত

লোকসঙ্গীত সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী

প্রতিবেদক॥ সত্তরের দশকের শেষাশেষি— ১৯৭৮ সাল। দু'টি মাটির গান মাতিয়ে দিল সারা বাংলা। ছেলে বুড়ো সবার মুখে সেই গানের কলি। 'বড়লোকের বিটি লো লম্বা লম্বা চুল, এমন খোঁপা বেঁধে দিব লাল গেঁদা ফুল' আর 'বলি ও ননদী আর দুমুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে, ঠাকুরজামাই এল বাড়িতে'। কথা বলে 'ভিনি, ভিডি, ভিসি', সত্যিই তাই প্রথম রেকর্ডেই একেবারে বাজার মাত। তাও রেকর্ডটা এইচ.এম.ভি বা কলম্বিয়ার মতন কুলিন কোম্পানি বের করেনি। বের করেছিল অশোকা কোম্পানির ঈগল কর্মাশিয়াল। এই রেকর্ডের মাধ্যমেই শিল্পীর সঙ্গে রেকর্ড কোম্পানির নামও ছড়িয়ে পড়ল দিগ্‌বিদিকে। সেই 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'— শিল্পীর নাম স্বপ্না চক্রবর্তী। গত ১ সেপ্টেম্বর তিনি ৬৫-তে পা দিলেন। আর তাঁর প্রথম জনপ্রিয়তম রেকর্ডের গানের ৩৫ বছর পূর্ণ হলো।

এই উপলক্ষে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ তাঁর নিজের জায়গা রাঢ় বাংলার বীরভূমের সিউড়ি শহরের ডি. আর. ডি. সি সভাঘরে আয়োজিত এক নাগরিক সভায় গত ৩১ আগস্ট রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর হাতে তুলে দিল নটরাজ সম্মান। মানপত্রটি পড়ে শোনান সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু। পুষ্পার্ঘ্য, উত্তরীয়, শাড়ি, মিষ্টান্ন ও পঞ্চফল তাঁর হাতে তুলে দেন সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গের সভাপতি আকাশবাণী মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট শিল্পী অধীর রায়। 'নটরাজ সম্মান' স্মারক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী—সবাই যাঁকে ফেলুদা বলেই বেশি চেনেন। সব্যসাচী চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন, ''এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে একজন গুণী শিল্পীকে সম্মান জানানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সংস্কার ভারতীকে ধন্যবাদ। স্বপ্নাদি বীরভূম জেলায় সংস্কার ভারতীর কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তা জেনে আমি আরও বেশি আনন্দিত। সব সময় ডাকলেই আসতে না পারলেও আমিও সংস্কার ভারতীর একজন।" সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তিলক সেনগুপ্ত।

স্বপ্না চক্রবর্তী

জন্ম বীরভূমের দেরপুর গ্রামে ১৯৫০ সালের ১ সেপ্টেম্বর শনিবার। বাবা নিত্যগোপাল চৌধুরী। মা সরসীবালা দেবীর অষ্টমগর্ভের সন্তান স্বপ্না। জেলা সদর সিউড়িতে পড়াশোনা এবং পরে এই শহরেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু। ৭ বছর বয়সেই সঙ্গীত শিক্ষার সূচনা। শিক্ষাগুরু সন্ন্যাসীচরণ ভাণ্ডারী। দাদা বিদ্যুৎ চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় সঙ্গীত জীবনের শুরু। মন্ত্রগুরু স্বামী সত্যানন্দ দেবের আশীর্বাদ তাঁর এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়। শান্তিনিকেতনে শিখেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। পরে অংশুমান রায়, প্রবীর মজুমদার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, ভি. বালসারা প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পীর সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁদের পথনির্দেশও পেয়েছেন। ১১ বছর বয়সে প্রথম প্রকাশ্য মঞ্চে অনুষ্ঠান।

১৯৭৫ সালে আকাশবাণীতে গান গাওয়া শুরু। প্রথম রেকর্ড ১৯৭৮ সালে 'বড়লোকের বিটি' ও 'বলি ও ননদী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুপার-ডুপার হিট। গানের কথা ছিল বীরভূমেরই স্বভাব কবি আশানন্দন চট্টরাজের। স্বামী মানস চক্রবর্তীও প্রথিতযশা গীতিকার ও সুরকার। শিল্পীর বহু রেকর্ডের গানের কথা ও সুর তাঁর স্বামীর। একমাত্র পুত্র দেবজ্যোতিও একজন সঙ্গীত শিল্পী।

দীনেন্দ্র চৌধুরী, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশানন্দন চট্টরাজ, মানস চক্রবর্তী প্রমুখ গীতিকার এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকান্ত নন্দী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুরকারের সুরে ইপিজেসি, এইচ এম ভি প্রভৃতি রেকর্ড কোম্পানিতে তিনি কত যে গান রেকর্ড করেছেন তার কোনো হিসেব নেই। চলচ্চিত্রেও প্লেব্যাক করেছেন বহু। অঞ্জন চৌধুরীর 'আব্বাজান' ছাড়াও 'দাহ', 'জীবন অনেক বড়', 'অন্যমুখ' প্রভৃতি ছবিতে কণ্ঠ দিয়েছেন। দেশ বিদেশে নানা সম্মানে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশের 'পল্লীকন্যা', ত্রিপুরা সরকারের পুরস্কার, প্রমথেশ বড়ুয়া স্মৃতি সম্মান, ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির মান্না দে স্মৃতি পুরস্কার উল্লেখযোগ্য।

সংস্কার ভারতীর 'নটরাজ সম্মান'-এ সম্মানিত হয়ে কিছু বলতে গিয়ে আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। পরে তিনি সকলের অনুরোধে দুটি গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন।

লোকসঙ্গীত সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তীকে 'নটরাজ সম্মান' প্রদান করছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
20 October - 2014

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা